ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

সভ্যতার সংকট

SEAN
PUBLICATION

আমরা বই পড়ি কেন? জানার জন্য। নিজেদের জানা, এ পৃথিবীকে জানা, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। এই জ্ঞানই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

জ্ঞানের আধার বই। জ্ঞানচর্চা আমাদের ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। তথ্য বিস্ফোরণে জ্ঞান আজ কোণঠাসা। শিক্ষার দৈন্যতায় অজ্ঞতার মহামারী। জ্ঞানার্জনে অনাগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের দুর্বোধ্য ভাষা, মলিন প্রচ্ছদ আর জীর্ণ পৃষ্ঠা পাঠ অনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। গ্রন্থকারাগারে বন্দি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের নয়, চারদিকে আজ লঘু বিনোদনের জয়জয়কার।

সিয়ান পাবলিকেশনের স্বপ্ন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপস্থাপন। ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর জ্ঞান।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ এবং তথ্যসূত্রে প্রামাণ্য; আমাদের লক্ষ্য সাবলীল ভাষা এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। সময়, শ্রম ও সম্পদ সাশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নিমিত্তে আমাদের রয়েছে ই-কমার্স সংযুক্তি **www.seanpublication.com** ক্লিকেই বই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের এ প্রসার আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশা আল্লাহ।

www.pathagar.com

ড. ফিলিপসের জীবনকে বর্ণাঢ্য বললে কম বলা হবে। কানাডায় অভিবাসিত একজন কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার সুবাদে পশ্চিমা সভ্যতাকে তিনি দেখেছেন একান্ত কাছে থেকেই।

তিনি কানাডাতে সিমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটিতে প্রাণরসায়নে লেখাপড়ার সময় সমাজতন্ত্রের ডাকে বইখাতা ফেলে রেখে রাস্তায় নামেন। কৃষ্ণাঙ্গ ও সমাজতন্ত্রীদের নানা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি এক পর্যায়ে সমমনা কম্যুনিস্টদের সাথে কম্যুনাল লিভিংয়ে অবধি কিছুদিন বাস করেন। পুঁজিবাদের পরে সমাজতন্ত্রের কুৎসিত রূপটি তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়; কেবল কারও বক্তব্য শুনে নয়।

এভাবে সত্যের সন্ধান খুঁজে ফেরা মানুষটি দিশা পান ইসলামের। তিনি আবিষ্কার করেন, সভ্যতা হোক আর সংস্কৃতি, ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ কোনো স্বার্থন্বেষী শ্রেণীর রচনা নয়; বরং তা এ বিশ্বচরাচরের স্রষ্টার বেঁধে দেওয়া বিধি-বিধান। কারচুপি কিংবা কারসাজির সেখানে কোনো স্থান নেই।

১৯৭২ সালে মুসলিম হবার পরে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা এবং ইসলামি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের উপর এমএ করেছেন রিয়াদ ইউনিভার্সিটি থেকে। ইসলামিক স্টাডিজের ওপর পিএইচডি করেছেন ওয়েলস ইউনিভার্সিটি থেকে। দির্ঘ দিন শিক্ষকতা করেছেন প্রেস্টন ইউনিভার্সিটি ইউএই, নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রিয়াদ এবং সুদানের অমদুরমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে।

Islamic Online University প্রতিষ্ঠার সুবাদে জর্দানিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষ ড. বিলাল ফিলিপসকে "The 500 most influential Muslim"এর তালিকায় স্থান দেয়। এ ইউনিভার্সিটিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে Diploma এবং টিউশন-ফি মুক্ত Bachelor of Arts প্রোগ্রামে লেখাপড়া করা যায়। তার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন: www.bilalphilips.com

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

সভ্যতার সংকট

www.pathagar.com

ভাষান্তর	জিম তানভীর
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার'ই সম্পাদনা	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পৃষ্ঠা সজ্জা	মাস'ঊদ শারীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শারীফুল আলম

www.pathagar.com

সভ্যতার সংকট

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

www.pathagar.com

সভ্যতার সংকট

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

গ্রন্থসূত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

www.seanpublication.com

+৮৮ ০১৭৮১১৮৩৫০১

প্রথম বাংলা সংস্করণ:

প্রথম মুদ্রণ: জুমাদা আস-সানি ১৪৩৬ হিজরি। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইংরেজি

দ্বিতীয় মুদ্রণ: শা'বান ১৪৩৭ হিজরি। মে ২০১৬ ইংরেজি

ISBN: 978-984-33-6882-9

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসূত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটি স্ক্যান কিংবা টাইপ করে ইন্টারনেটে আপলোড করা; ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

বাড়ি - গ-৪০/৫, এম এইচ বি মোনালি, ফ্ল্যাট - সি-১

শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা।

www.pathagar.com

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তাঁর জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তাঁর সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তাঁর এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> *"কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।"* [সহীহ আল-জামি' আস্-সাগীর, হাদীস্ নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।" [আল-বাক্বারাহ, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [আল-মা'ইদাহ, ৫:৮৭]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান ৫

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা ৯

প্রকাশকের কথা ১১

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায় ২১

পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাবিন্দু ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫

রেওয়াজ-প্রথার জালে বাঁধা পড়া ইসলাম ৪৫

তৃতীয় অধ্যায় ৭৯

ইসলামি সংস্কৃতি ৭৯

চতুর্থ অধ্যায় ৮৯

ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহ ৮৯

অধ্যায় পাঁচ ১১৫

ঈমানের স্তম্ভসমূহ ১১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রতিবর্ণীকরণ তালিকা

আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হার্ফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أ-ء	’	ض	দ্
آ-ئ	আ-া	ط	ত্
ب	ব	ظ	জ্
ت	ত	ع	‘
ة	হ/ত (পরে আরবি শব্দ থাকলে)	غ	গ
ث	স়	ف	ফ
ج	জ	ق	ক্
ح	হ্	ك	ক
خ	খ	ل	ল
د	দ	م	ম
ذ	য্	ن	ন
ر	র	ه-ه	হ
ز	য	و	ও
س	স	و (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	ঊ/ূ
ش	শ	ي	ই
ص	স্	ي (স্বরচিহ্ন হিসেবে)	ঈ/ ী

www.pathagar.com

অধস্বর ও স্বরচিহ্ন

আরবি হারফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি হারফ	বাংলা প্রতিবর্ণ
أوْ، وَ	*আও/আউ*	أيْ، يَ	*আই/আয়*
ـَ ফাতহাহ	া	ـّ শাদ্দাহ	দ্বিত্ব অক্ষর
ـِ কাসরাহ	ি	ـْ সুকূন	্ (হস্ চিহ্ন)
ـُ দাম্মাহ	ু		

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিজ্ঞান আর সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে বেশ বড় একটা তফাত রয়েছে। বিজ্ঞান বলে ১ মানে এক, ০ মানে শূন্য। সমাজবিজ্ঞানীরা এই ১ আর শূন্যকে ঠিক বাইনারি অর্থে নেবেন না। এর মধ্যে দশমিক বসিয়ে নানান কিসিমের ভাগ বাটোয়ারা করবেন। এক কিংবা শূন্যের সংজ্ঞাটা তাদের কাছে বর্ণালিসম, ধ্রুব কিছু নয়। কেন? কারণ তারা সমাজ নিয়ে কাজ করেন। মানুষের সমাজ। আর বিজ্ঞানী মানুষের মনও যে বিজ্ঞান মানে না তা কে না জানে? মানুষ ভাবে এক, করে আরেক, করা শেষে তার মনে হয় সে আসলে করতে চেয়েছিল অন্য কিছু। সেই সমাজবিজ্ঞানের দুটো বিষয় ভারি গোলমেলে—সংস্কৃতি আর সভ্যতা।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন সংস্কৃতি মানুষের অবস্তুগত সৃষ্টি, আর সভ্যতা বস্তুগত। যেমন চা-বাগান কিংবা চা-পাতা প্রক্রিয়াজাত করার কারখানাটা সভ্যতার অন্তর্গত। কিন্তু চা খাওয়ার যে রেওয়াজ ব্রিটিশরা আমাদের রক্তে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে সেটা সংস্কৃতি। চা-শ্রমিকদের একটি কুঁড়ি আর দুটি পাতা তোলার কানুনটিও সংস্কৃতির অংশ। চা-শ্রমিকদের যে বেতনটা দেওয়া হয় তাও এক প্রকারের সংস্কৃতি—শোষণের সংস্কৃতি। শোষণ যে করা হচ্ছে সেটা বুঝতে না দেওয়ার নিমিত্তে 'ছোটলোকগুলোকে' মহুয়ামদে মাতাল করে রাখাটা ব্রিটিশ বেনিয়া বুদ্ধি। এই বুদ্ধিহীনকরণের আয়োজনের পোশাকি নামও সংস্কৃতি বটে।

গোলমালটা আসলে এখানেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে মানুষ যা সৃষ্টি করেছে তার যথার্থতা কী? মানুষ স্বার্থপর। যে আইন, যে রীতি, যে প্রথা, যে যন্ত্র সে সৃষ্টি করে তাতে আবিষ্কারকের স্বার্থ থাকে ষোলআনা। মানবরচিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণ কখনো কখনো দেখলেও মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থরক্ষাই তার মূল কথা; সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণকে করে উপেক্ষা। চা কোম্পানির মালিক আর শ্রমিকদের সম্পদ ও শ্রমের অসম বণ্টন তারই উদাহরণ।

www.pathagar.com

সভ্যতা কীসের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে? কিছু নৈতিক ভিত্তির উপরে। কিন্তু আসলে কি তাই ঘটে?

প্রাচীন ভারতের সভ্যতাটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক।

আদি এবং বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে অস্ট্রিয়-জার্মান পণ্ডিত মুহাম্মাদ আসাদ Islam at The Crossroads বইটিতে বলেছেন,

অর্থনৈতিক, সামাজিক আর জাতীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছুকে আমলে নিতে পশ্চিমা সভ্যতা নারাজ। তারা যাকে পূজা করে তার নাম আরাম, তাতে কোনো আত্মিক ব্যাপার-স্যাপার নেই। আর এ সভ্যতার যদি বুক চিরে দেখা যেত তাতে পাওয়া যেত কেবলই ক্ষমতার মত্ত কামনা।

শ্বেতশুভ্র ইংরেজদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে গুণমুগ্ধ রবি ঠাকুর শেষমেশ বলেই ফেলেছেন,

> ...সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। ...এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত ইউরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।

নৈতিকতার কোনো স্থান নেই এই সভ্যতায়; কারণ নৈতিকতার কোনো বাজারমূল্য নেই যে। বাজারমূল্যের যে মূল্য কত তা মার্কিন কথাশিল্পী মার্ক টোয়েন বেশ বলেছেন,

www.pathagar.com

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who sits in Darkness has been a good trade and has paid, well, on the whole; and there is money in it yet...

শ্বেতাঙ্গারা যে আফ্রো-এশীয়দের উন্নয়নকল্পে পুওর ম্যান'স বারডেন বহন করতে রাজি হয়েছিল তা মহত্ত্বের তাড়নায় নয়, নিছক বৈভব কামনায়।

এখন প্রশ্ন, বর্তমান পৃথিবীর নানা সভ্যতা থেকে যে দুর্গন্ধ আসছে তা ঢাকা পড়ছে কীভাবে? মার্কিন পণ্ডিত নোয়াম চমস্কির মতে মানুষকে নিষ্ক্রিয়তা শেখানো হয়, মুখ বুজে কর্তৃপক্ষের অনাচার মেনে নিতে তালিম দেওয়া হয়। মগজে গেঁথে দেওয়া হয়—মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যের চেয়ে ব্যক্তিসুখ প্রবল। জুজুর ভয় দেখানো হয়। দুনিয়াতে আসলে কী হচ্ছে সেটা সবাই জানলে মুশকিল। কে জানে হয়তো তারা ঘোর ভেঙে জেগে উঠবে।

আমাদের এ বইটির নাম 'সভ্যতার সংকট'। এটি পশ্চিমা এবং ইসলামি সংস্কৃতির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা। ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপসের 'মোরাল ফাউন্ডেশনস অব ইসলামিক কালচার' শীর্ষক বইয়ের অনুবাদ।

ড. ফিলিপসের জীবনকে বর্ণাঢ্য বললে কম বলা হবে। কানাডায় অভিবাসিত একজন কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার সুবাদে পশ্চিমা সভ্যতার এমন অনেক কিছু তিনি দেখেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অকপটে স্বীকার করেন,

ইউরোপীয়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সেই অহমিকাবোধ থেকেই তারা অন্যসব সমাজকে অবলীলায় চূর্ণ করে। তাদের এই জাত্যাভিমানের ছাপ তাদের শিল্প-সাহিত্যের সর্বত্রই প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

তিনি কানাডাতে সিমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটিতে প্রাণরসায়নে লেখাপড়া করতে করতে সমাজতন্ত্রের ডাকে পড়া ছেড়ে দেন। কৃষ্ণাঙ্গ ও সমাজতন্ত্রীদের নানা আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এমনকি এক পর্যায়ে সমমনা কম্যুনিস্টদের সাথে কম্যুনাল লিভিংয়ে অবধি কিছুদিন বাস করেন। পুঁজিবাদের পরে সমাজতন্ত্রের কুৎসিত রূপটি তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় এই সময়ে। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্রের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। মদ, সমকাম, শিশু নির্যাতন—যেটাকেই মানুষ নৈতিক মনে করবে সেটাকেই আমাদের 'ঠিক আছে' বলে মেনে নিতে হবে।

এমতাবস্থায় সত্যের সন্ধানে চলা মানুষটি দিশা পান ইসলামের। তিনি আবিষ্কার করেন, সভ্যতা হোক আর সংস্কৃতি, ইসলামি সমাজের বুনিয়াদ বিশ্বচরাচরে স্রষ্টার বেঁধে দেওয়া বিধি-বিধান। মানুষের কারচুপি কিংবা কারসাজি, কোনো কিছুরই সেখানে কোনো স্থান নেই।

মুসলিম হবার পরে তিনি মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা এবং ইসলামি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর জীবন চলা পথের মতো ইসলাম শেখাটাও ছিল কঠিন। পরিত্যক্ত আর্মি ব্যারাকে থাকতে হতো। দু'দুবার মরু কাঁকড়াবিছের কামড় খাওয়ার পরেও তিনি দমে যাননি। দমে যাননি বলেই আজ তিনি আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নির্মোহ বিশ্লেষণ করে শোনাতে পারছেন। আমাদের দেখিয়েছেন কেন এবং কীভাবে ইসলামি সভ্যতা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা—অনেক বেশি মানবিক, অনেক বেশি স্বার্থহীন, মানবসভ্যতার জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর।

পশ্চিমা সভ্যতা এখন আর পশ্চিমে আবদ্ধ নেই, সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি বলতে কিছু নেই। ভোগবাদে শুরু, ভোগবাদেই শেষ। পার্থিবতার সংস্কৃতি মানুষকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য হলো মৃত্যু, আর সত্যিকার জীবন শুরুই হবে সে মৃত্যুর পরে। আমরা মানুষের ভুলের এই চক্রটা ভাঙতে চাই।

সাইয়িদ কুতুব বলেছিলেন ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা, বাকি সব অসভ্যতা। বাঙালি দার্শনিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন সুসভ্যতা আর কুসভ্যতার কথা। এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য কী? আমাদের এই বইটি তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস মাত্র। চিন্তাশীল পাঠককে একমত হতে হবে—এমন নয়, তবে পথ পরিক্রমায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ রইল।

সিয়ান পাবলিকেশনের পক্ষে,

শরীফ আবু হায়াত অপু

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, খোদ মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে চলমান সংঘাতের আসল কারণ 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব'। এই একুশ শতক এবং একুশ শতককে ছাড়িয়ে মুসলিম জাতির সভ্যতার সাথে ইসলামের এই যে সুগভীর সম্পর্ক, তা উপলব্ধি করতে হলে 'সংস্কৃতি' এবং সংস্কৃতির আলোচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা সম্পর্কে সুচ্ছ ধারণা রাখা অপরিহার্য।

সংস্কৃতি বা ইংরেজিতে 'culture', শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'cultura' (কালচারা) থেকে, যেটি ক্রিয়াবাচক শব্দ 'colere' থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ যত্ন নেওয়া, কিংবা বিকাশ সাধন করা। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে এই শব্দটিকে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করা হয় training of the mind (মনের পরিশীলন) অথবা manner (আচার-রীতি)[৩] অর্থে। তবে নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায়, সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরন বা রীতি'[২] বোঝাতে।

"মূলত, মানুষ যা কিছু করে, এবং যা কিছু থেকে বিরত থাকে, তা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠার ফলাফল, যা হয়তো একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির"- এ পর্যবেক্ষণ থেকেই সংস্কৃতি নামক ধারণার উদ্ভব। মানুষ যেমন জৈবিকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী লাভ করে, তেমনিভাবে সমাজ থেকেও সে কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।[৩]

---

(১) কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ৭, ম্যাকমিলিয়ান এডুকেশনাল কোম্পানি, নিউইয়র্ক, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫৬০।

(২) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫৮, যদিও-বা সকল ঘরানার ছাত্রই সংস্কৃতির ধারণাটির অপরিহার্য গুরুত্বকে বাহ্যত স্বীকার করে, তবুও সংস্কৃতির কোনো সংজ্ঞাই আজ পর্যন্ত সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

(৩) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫৮।

www.pathagar.com

জৈবিক যেসব বৈশিষ্ট্য বা অভ্যাস জন্ম পরম্পরায় সকল মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে আছে ঘুমানো, নিকটজন ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা, হাসি-কান্না ইত্যাদি। আর সামাজিক পরম্পরা নির্দেশ করে একটি সমাজের আচার-প্রথা বা ঐতিহ্যকে, যেগুলো সাধারণত সমাজভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে, সবচেয়ে সহজভাবে বলা যায় যে , "মানব সমাজের যে উপাদানসমূহ মানুষের নিজের তৈরি তা-ই হলো সংস্কৃতি" কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে, "প্রতিটি মানুষ তাদের পরিবার এবং শিক্ষা-দীক্ষায়, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের সমাজের প্রচলিত যে প্রথা এবং ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বেড়ে ওঠে সেটাই হলো সংস্কৃতি।"[৪]

গোটা বিশ্বজুড়ে আমরা আজ অ্যামেরিকা এবং পশ্চিমা ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির জয়জয়কার দেখতে পাই। গোটা বিশ্বে তাদের এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনামলে; বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগেও পরোক্ষ শাসন হিসেবে তা টিকে আছে। মিডিয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে বিংশ শতাব্দীতে এসে পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তাই এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে নেংটি পড়া দক্ষিণ অ্যামেরিকান কোনো উপজাতি তরুণকে অ্যামাজনের গহীন জঙ্গালে মাথায় নাইকি'র লোগো সম্বলিত বেসবল ক্যাপ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কিংবা যখন দেখা যায়, কোনো এক মঙ্গোলিয়ান ঘোড়সওয়ার অ্যাডিডাসের ডোরাকাটা সোয়েট-প্যান্ট পরে, কিংবা রেবক এর ট্রেইনার পায়ে দিয়ে গোবি মরুভূমিতে ধাবমান। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আজ প্রবল। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এই সংঘাত একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সবখানেই সংস্কৃতি এমনই একটি বিষয় যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিসূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন সভ্যতার এই সংঘাতকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এভাবে:

"ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে স্বয়ং ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ

(৪) কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ৭, পৃষ্ঠা ৫৫৮।

www.pathagar.com

এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্যেও CIA কিংবা অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সত্যিকার কোনো সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা পৃথিবীর মানুষকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনে এটাই হলো মূল কারণ।"(৫)

বর্তমান সময়ে যদিও বা ব্যাপক মাত্রায় প্রচার করা হয়ে থাকে যে, "ইসলামি মৌলবাদই পশ্চিমাদের নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।" পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইসলামি মৌলবাদকে বিশ্বের সকল সমস্যার মূল কারণ আখ্যা দিতে ব্যস্ত। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ব্যাপারটি এসেছে এভাবে,

"বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলবাদ আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। একইভাবে তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ, এবং পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিল, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে।"(৬)

কিন্তু অধ্যাপক হান্টিংটন এসব দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে গোটা ইসলামকেই পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবেই পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিপরিতধর্মী। তিনি এর পেছনে মুসলিমদের দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে করেন।

---

(৫) দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস, পৃষ্ঠা ২১৭-৮।

(৬) নিউ ইয়র্ক টাইমস/ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৯/৯/৯৩।

www.pathagar.com

১. মুসলিমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যে কোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যে কোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। "ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"—এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা তো সত্যিই যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় তা নিশ্চিতভাবে মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমান থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি থেকে উৎকৃষ্ট হবে।

২.মুসলিমদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শারী'আহ্ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। আলজেরিয়া, মিশর, চেচনিয়া, দাগেস্তান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে যে চলমান অস্থিতিশীলতা, তা এই স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক যুগে তারা মুসলিম দেশগুলোর শারী'আহ্ ভিত্তিক আইনব্যবস্থাকে ইউরোপিয়ান আইনকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। আর নব্য সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু মুসলিম দাবিদারদের হাতেই শাসন-কর্তৃত্বের লাগাম উঠেছে এবং তারাও সেই ইউরোপিয়ান আইন অনুসারে মুসলিম দেশগুলো শাসন করে চলছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। একারণে ইসলামি পুনর্জাগরণের ঢেউ মুসলিম বিশ্বকে বারবার আন্দোলিত করেছে। মুসলিম জাতির মনে বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার দাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রশাসনের সাথে সহিংস সংঘাতের আকারে। ইন্দোনেশিয়ার মতো ৯৫% মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশে সুকর্ণ (১৯৪৫-১৯৬৫) এবং তার উত্তরসূরী সুহার্তোর শাসনামলে (১৯৬৮-১৯৯৮), Pancasilia[৭] কে রাষ্ট্রধর্ম

(৭) আক্ষরিক অর্থে, "পাঁচটি মূলনীতি"। সুকর্ণ এই পাঁচটি মূলনীতি সর্বপ্রথম ১ জুন, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিজ সমর্থিত প্রিপারেটরি কমিটি ফর ইন্ডিপেনডেনস এর কাছে উত্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, ভবিষ্যৎ ইন্দোনেশিয়ান রাষ্ট্রটি পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক উন্নয়ন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৯, পৃষ্ঠা ১০৮)

www.pathagar.com

বা রাষ্ট্রের মূল দর্শন হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলগুলোতে এই দর্শনই শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে ইসলামি আইনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবর্তন করার দাবিকেই রীতিমত একটি রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৮ সালে যখন প্রবল জনরোষের মুখে সুহার্তোর পতন ঘটে, তখন ক্ষমতালোভী প্রতিটি ব্যক্তি, এমনকি সুহার্তোর তল্পিবাহক বি জে হাবিবি সহ সকলেই তৎক্ষণাৎ ইসলামের প্রতি নিজেদেরকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগে। ১৯৯৯ এর নির্বাচনে, সুকর্ণতনয়া মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন ইসলামি দল নাহদাতুল উলামা'র নেতা আব্দুর রাহমান ওয়াহিদের কাছে, যিনি প্রায় অন্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরাও করতে পারেন না।

অধ্যাপক হান্টিংটন অ্যামেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) কে মুসলিমদের প্রধান শত্রু মনে করার যৌক্তিকতাকে নাকচ করে দিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন দেশের সরকার পতন এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সিআইএ'র যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। কিন্তু তারপরও তিনি বলছেন যে, সিআইএ মুসলিমদের প্রধান শত্রু নয়। তিনি অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীকেও এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন; যদিও বা সৌদি আরবের মাটিতে এই সেনাবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং ইরাককে ধ্বংস করেছে, সুদান এবং আফগানিস্তানে মিসাইল আক্রমণ করেছে এবং প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আসছে। সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে হান্টিংটন বলেন যে, মুসলিম বিশ্ব প্রধান যে সমস্যা মোকাবেলা করছে তা হলো—খোদ পশ্চিমা সভ্যতা; এটা নিছক সিআইএ'র ষড়যন্ত্র বা অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিষয় নয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, এ সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধারাকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির চেয়ে উন্নততর মনে করা। পশ্চিমারা মনে করে, অন্য সকলের উচিত পশ্চিমা সভ্যতাকে মেনে নেওয়া, তার রীতি-নীতি অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে মূল কারণ হলো ডারউইনিজম। এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির উৎকর্ষ ঘটে এবং একটি

www.pathagar.com

ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবসমাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের কল্পিত পূর্বপুরুষ বানর থেকে আরম্ভ করে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিক অগ্রগতি হয়ে আসছে। গত কয়েক শতক জুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের "যোগ্যরাই টিকে থাকে" শীর্ষক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানটি দেওয়া হয়েছে। আর এর ভিত্তিতেই তারা দাবি করে যে, তাদের সভ্যতার মধ্যেই নিহিত আছে গোটা মানবজাতির মুক্তি।

অধ্যাপক হান্টিংটন আরও একধাপ এগিয়ে যে বাস্তবতাটি আবিষ্কার করেছেন তা হলো, পশ্চিমারা নিজেদের জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকলের জন্য কেবল যথাযথই মনে করে না, বরং অন্যদেরকে তাদের সংস্কৃতি মেনে নিতে বাধ্য করাকেও তারা তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। আর সে 'দায়িত্ব' পালনের জন্য রাজনৈতিক, কূটনৈতিক কিংবা সামরিক পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই ব্যাপারগুলো যে সভ্যতার চলমান সংঘাতে মূল উপাদান ও অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে তা প্রফেসর হান্টিংটন যথার্থই সনাক্ত করেছেন।

একারণে শুরুতেই পশ্চিমা সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনার পর এ বইটির মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু 'ইসলামি সংস্কৃতির নৈতিক ভিত্তি' আরম্ভ হবে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাবিন্দু

আজকের পশ্চিমা সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপে। পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রায়ই গ্রিক-রোমান সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ এর সূচনা হয়েছিল মূলত গ্রিস এবং রোমে। ইউরোপের অন্যান্য অংশ ছিল তখনো বর্বরতা আর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে অন্য সবখানের মতো গ্রিস এবং রোমেও মূর্তিপূজাই ছিল তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তারা নানা রকম দেবতার উপাসনা করত। তারা মনে করত মানুষ এবং সেই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হলো কেবল এই যে, দেবতারা অমর আর মানুষ মরণশীল; এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার সবকিছু এই দেবতারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন, দেবতা জিউস (zeus) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, পসেইডন (Poseidon) এর হাতে আছে সমুদ্রের কর্তৃত্ব, ফল-ফসলের মালিক দেবতা ডেমেটার (Demetar)। আরও আছে হেরা (Hera), যে হচ্ছে বিয়ের দেবী, আছে ফরচুনা (Fortuna), যার হাতে আছে ভালো-মন্দ অর্থাৎ ভাগ্যের চাবিকাঠি, ডায়ানা (Diana) হচ্ছে প্রেমের দেবী, এরকম আরও অনেক। গ্রিক পুরাণ মতে, প্রধান দেবতা জিউস (Zeus রোমে যাকে জুপিটার হিসেবে অভিহিত করা হয়) এর নেতৃত্বে অলিম্পাস পাহাড়ে এই দেবতাদের বসবাস। মানুষের অবয়বে মূর্তি বানিয়ে এই দেবতাদের পূজা করা হতো। আর তাদের উপাসনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো, এসব দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া। দেবতাভেদে বলির পশুও ভিন্ন ভিন্ন হতো। যেমন, হেরা দেবীর জন্য উৎসর্গ করা হয় গরু, জিউস এর জন্য ষাঁড়, আর দেবতা ডেমেটার'র জন্য বলি হতো শূকর।[১]

(১) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৫, পৃষ্ঠা ৪৬২।

www.pathagar.com

প্রভাব

প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে যে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও বা তাদের জীবন থেকে ধর্মীয় অনুশাসন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন, প্রতিটি দিনের নামের কথাই ধরুন। প্রতিটি দেশেরই নিজ ভাষায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের নাম আছে, তবে ইংরেজি নামগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর সাথে পৌত্তলিকতার ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। রোমানরা যে দিন যে গ্রহের উপাসনা করত, সে দিনের নাম রাখা হয়েছে সেই দেবতার নামের সাথে মিল রেখে। শনিবার বা Saturday শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Saeterndaeg থেকে, যার মানে হচ্ছে 'শনি বা Saturen এর দিবস' (Saturn-স্যাটার্ন হলো রোমানদের কৃষিদেবতা)। রবিবার বা Sunday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Sunnandaeg থেকে, যার অর্থ হলো 'সূর্য দিবস', আর সোমবার বা Monday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Monandaeg থেকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর নামের উৎপত্তি জার্মান পুরাণে দেবতাদেরকে যে নামে অভিহিত করা হতো সেগুলোর ব্রিটিশ-ফরাসি প্রতিশব্দ থেকে। যেমন, মঙ্গলবার, ইংরেজিতে বলা হয় Tuesday, এটি এসেছে Tiwesdage থেকে, এর মানে হলো Tiw (Tiw হলো Tyr নামক নরওয়েজিয়ান যুদ্ধদেবতার নামের ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ) এর দিবস। বুধবার বা Wednesday এসেছে Wodnesdaeg থেকে, এর মানে Woden এর দিবস, সে জার্মানদের প্রধান দেবতা। বৃহস্পতিবার বা Thursday এসেছে Thunor (Thor) থেকে, বজ্রদেবতার ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ অনুসারে। আর শুক্রবার এসেছে Frigedaeg থেকে, যার অর্থ দেবী ফ্রিগ (Frig) এর জন্য নির্ধারিত দিবস। সৌন্দর্য আর ভালবাসার দেবী ফ্রিগ (Frig) হচ্ছে দেবতা Woden এর স্ত্রী।[২]

পশ্চিমা সভ্যতার শিকড় সন্ধানে বের হলে তার আরেকটি পরিচয় আমাদের সামনে দৃশ্যমান হবে; আর তা হলো এটি ইহুদি-খ্রিষ্টান সংস্কৃতি ভিত্তিক একটি সভ্যতা। 'ঈসা ﷺ ছিলেন ইহুদি জাতির মধ্যে প্রেরিত একজন

(২) চেম্বার্স পকেট ডিকশনারি, ডব্লিউ এন্ড আর চেম্বার্স লিমিটেড, এডিনবার্গ, ১৯৯২, এবং দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১২, পৃষ্ঠা ৫৫৫।

www.pathagar.com

নাবি, তিনি মূলত 'তাওরাত' এর অনুসরণ করতেন; খ্রিষ্টানরা বাংলায় যাকে বলে থাকে যিশু খ্রিষ্ট, আর ইংরেজিতে Jesus। কিন্তু 'ঈসা ﷺ যে শিক্ষা দিয়েছিলেন কালক্রমে তার সাথে গ্রিক এবং রোমানদের পৌত্তলিকতা মিশে গিয়ে তার প্রকৃত শিক্ষার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে ফেলে। তৎকালীন রোমান এবং গ্রিক দেবতাদের আকৃতি ছিলো মানুষের মতো। তাদের ব্যাপারে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তারা মানুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং সে সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয় অর্ধদেবতা বা হাফ-গড। অনুরূপভাবে তাদের গড়া নতুন ধর্মে যিশু খ্রিষ্টকে বানানো হলো 'রক্তমাংসে ঈশ্বর' বা 'মানবদেবতা'। তিনি এই পৃথিবীতে মানবরূপে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন এমন এক নারীর গর্ভে, যিনি সাধারণ মানুষের মতো চলতেন ফিরতেন। ঈসা ﷺ, তার মা মারইয়াম এবং খ্রিষ্টধর্মের কিছু সাধুসন্ত ব্যক্তির মূর্তি পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানদের উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সমবেত উপাসনার দিন সাবাত বা শনিবারের পরিবর্তে রবিবার নির্ধারণ করা হয়। রোমে রবিবার ছিল সূর্য দেবতা 'অ্যাপোলো'কে উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন; অ্যাপোলো হলো রোমানদের শীর্ষ দেবতা জুপিটারের পুত্র। এভাবে তাদের উপাসনার নির্ধারিত দিনকে সরিয়ে আনার পেছনে অভিসন্ধি ছিল রোমানদেরকে তাদের ঈশ্বরের পুত্র অ্যাপোলোর সাথে Jesus এর সাদৃশ্য দেখিয়ে তাদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা।

খ্রিষ্টবাদের সাথে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ক্রিসমাস ডে, যাকে প্রাচীন ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে Cristes maesse, অর্থাৎ খ্রিস্টের আগমন। কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই রোমান ক্যাথলিক চার্চ ২৫ ডিসেম্বরকে যিশু খ্রিস্টের জন্ম তারিখ হিসেবে গ্রহণ করে। এর আগে সর্বশেষ তার জন্মদিন উদ্‌যাপনের রেকর্ড পাওয়া যায় ৩৩৬ সালে রোমে।[৩] এই ২৫ ডিসেম্বরের সাথে মিলে যায় রোমানদের 'অজেয় সূর্যের জন্মদিন' (natalis solis invicti) এর উৎসব। এই উৎসব উদ্‌যাপিত হতো সূর্যের দক্ষিণায়নের দিনে, যেদিন থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে শুরু করে। এই তারিখটি আরও মিলে যায় স্যাটার্নালিয়া উদ্‌যাপনের দিনের সাথে (১৭ ডিসেম্বর), যে দিন উপহার বিনিময় করা হয়।[৪] গাছপালার উপাসনা করা

(৩) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে ৬ জানুয়ারি এ অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হতো।

(৪) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ২৮৩।

www.pathagar.com

ছিল পৌত্তলিক ইউরোপিয়ানদের খুব সাধারণ রীতির একটি। পরবর্তীকালে তারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও চিরসবুজ গাছ বা ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে বাড়িঘর সাজানোর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রথার মধ্য দিয়ে তাদের এই পৌত্তলিকসুলভ অভ্যাসটি টিকে থাকে।(৫)

এছাড়াও, পশ্চিমা কোনো দেশে ঘুরতে গেলে আপনি দেখতে পাবেন এপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স কিংবা হোটেলগুলোতে ১৩ নম্বর বলে কোনো ফ্লোর নেই! কেউই ১৩ নম্বর বাসা, এপার্টমেন্ট কিংবা ফ্লোরে থাকতে আগ্রহী নয়!

একটি মজার ঘটনা ঘটে ষাটের দশকের শেষ দিকে। ঘটনাটি হলো, একটি অ্যাপোলো মহাকাশযান চাঁদে যাত্রা করে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। মহাকাশে হারিয়ে যেতে যেতে একেবারে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় এবং কোনোমতে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এরপর ক্রুদেরকে আটলান্টিক থেকে উদ্ধার করে কেপ কার্নিভালে বেইসে ফিরিয়ে আনা হলে সাংবাদিকরা ফ্লাইট কমান্ডারের কাছে এই বিপজ্জনক ভ্রমণ সম্পর্কে তার অনুভূতি জানতে চান। তিনি বলেন, "তার আগেই বোঝা উচিত ছিল এমন কিছু একটা হবে।" তারা জানতে চাইল মহাকাশযানে কোনো কারিগরি ত্রুটি ছিল কিনা যেটা তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে? তিনি বললেন, এমন কিছু নয়, বরং ব্যাপারটি হলো, তাদের ফ্লাইটটি ছিল অ্যাপোলো-১৩, যেটা ১৩ তারিখ শুক্রবারে ঠিক ১৩:১৩ মিনিটে নিক্ষিপ্ত হয়! ১৩ সংখ্যার ব্যাপারে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই বিশ্বাসের সূত্র ধরে পেছনের দিকে যেতে থাকলে আমরা দেখতে পাব, এর সূত্রপাত মূলত খ্রিষ্টান ঐতিহ্যে। এ ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিষ্ট তার শিষ্যদের নিয়ে যে 'অন্তিম নৈশভোজ' করেছিলেন সেখানে তাদের সংখ্যা ছিলো ১২ জন, যিশুসহ যা দাঁড়ায় ১৩ তে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো জুডাস, যে যিশু খ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মতে যা পরবর্তীতে যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই ভাগ্যের ভালো-মন্দের ব্যাপারে পৌত্তলিকদের বিশ্বাসটি ১৩ সংখ্যার মোড়কে নতুনরূপে আবির্ভূত হয় পশ্চিমাদের কাছে।

(৫) ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৪।

www.pathagar.com

রোমান সভ্যতার ইতিবৃত্ত

"রোমান সভ্যতার সাথে জার্মান ও খ্রিষ্টবাদী সংস্কৃতি একীভূত হয়ে মধ্যযুগীয় পশ্চিমা সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়।"(৬)

রোমান ক্যাথলিক চার্চের ছত্রছায়ায় সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদী রাজা-বাদশারা বিকৃত খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গোটা ইউরোপ জুড়ে।(৭) ইউরোপের 'রেনেসাঁ' বা 'পুনর্জাগরণ' মূলত ক্যাথলিক চার্চের এই অন্ধ বিশ্বাসের শিকল ছিঁড়ে মুক্তচিন্তা, সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণার জগতে তাদের প্রবেশের ইতিহাস নির্দেশ করে। ইতিপূর্বে চার্চগুলো এই ধরনের যেকোনো বিজ্ঞানমনস্ক স্বাধীন চিন্তাকে গলা টিপে হত্যা করত। ক্যাথলিক চার্চের স্বীকৃত বিশ্বাসগুলোর যেকোনো দিক নিয়ে প্রশ্ন করলে তাকে 'পথভ্রষ্ট' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হতো; এমনকি অনেককে খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। চার্চের এই শাসনামলই পরবর্তীকালে 'অন্ধকার যুগ' (Dark Age) নামে কুখ্যাত হয়। এই রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নতুন দুটি ধারার সূত্রপাত ঘটে।

১. প্রথমটি হলো মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬), ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে ধর্মের সংস্কার আন্দোলন।

২. দ্বিতীয়টি ছিল ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করার আন্দোলন, যার কর্ণধার ছিলেন ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এর মতো ব্যক্তিবর্গ।

সংস্কার আন্দোলনটি পরবর্তীতে 'প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরা রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন আচার-প্রথা, কৃত্যানুষ্ঠান এবং চার্চের পুরোহিতবাদকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাবার প্রয়াস চালায়। চার্চের নেতৃবৃন্দের সাথে

(৬) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১৮, পৃষ্ঠা ৬০৫।

(৭) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের (খ্রিস্টাব্দ ৩৯৫)পর থেকে রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত সময়কাল। এই পরিভাষার জন্ম সেসব ইতালীয় মানবতাবাদীদের হাতে, যারা প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিল। হাজার বছরের অজ্ঞানতা আর অন্ধকারের যুগ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করতে তারা এই শব্দের প্রচলন করে। (দি নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ১০৭)।

www.pathagar.com

তীব্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়ায় অনেক সংস্কারপন্থীকে চার্চ থেকে বহিস্কার করা হয়, যার পথ ধরে ইউরোপ জুড়ে এরা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এসব চার্চে যিশু খ্রিষ্টের মা মেরিকে আর উপাসনা করা হতো না, কিংবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য সাধুসন্তদের মধ্যস্থতা গ্রহণ করা হতো না। সংশোধিত এ ধর্মে চার্চের পুরোহিতরা বিয়ে করার অনুমতি লাভ করে। পোপের কর্তৃত্বকে এখানে আগের মতো ভুলের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করা হতো না। কমিউনিওন নামের যে একটি প্রথা তাদের মধ্যে আগে চালু ছিল, যেখানে ছোট রুটির টুকরো দিয়ে সমবেত জনতাকে আপ্যায়ন করা হতো এই বিশ্বাসে যে, সেই রুটির টুকরোগুলো কোনোভাবে যিশু খ্রিষ্টের শরীরে রূপান্তরিত হয়; সে প্রথাকে বর্জন করা হয়। একই সাথে বর্জন করা হয় চার্চের আচার-অনুষ্ঠানে ল্যাটিন ভাষার প্রয়োগকেও।

অন্যদিকে, ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল; তা স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং ধর্মে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ও ধর্মের বৈধতা নিয়ে সন্দেহের তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তৎকালীন দর্শনের পাঠচক্রগুলোতে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ব্যাপারটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো ইতিহাসে নাস্তিকতার ধারণাটি ব্যাপক মাত্রায় বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। প্রথমদিকে চুপিসারে এর প্রচার-প্রসার শুরু হলেও পরবর্তীতে প্রকাশ্যে, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিতর্কে নাস্তিকতার আলোচনা স্থান পেতে থাকে।

সৌরজগৎ নিয়ে কপার্নিকাসের তত্ত্ব ঘিরে যে লড়াই, তার হাত ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে এলো একটি ব্যাপক পরিবর্তন; যাকে অভিহিত করা হয় 'কপার্নিকান বিপ্লব' বলে। এই লড়াইয়ের নায়ক ছিলেন গ্যালিলিও। তিনি দাবি করলেন, তার নতুন টেলিস্কোপের সাহায্যে যে পর্যবেক্ষণ তিনি করেছেন তা কপার্নিকাসের তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপাদন করে। অথচ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যা বিশ্বাস করে এসেছে, এ তত্ত্ব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বললেন, সূর্য স্থির; এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার চারদিকে নিজ অক্ষে আবর্তন করার যে তত্ত্ব কপার্নিকাস নিয়ে এসেছেন সেটাই সত্য। তার এই বক্তব্য এরিস্টোটলের অনুসারীদের জন্য স্বস্তিদায়ক

www.pathagar.com

হলো না, তারা চার্চের সাথে যোগসাজশ করে গ্যালিলিওর মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাকে পথভ্রষ্ট হিসেবে ঘোষণা করে।[৮] এই ঘোষণার মাধ্যমে চিন্তাশীল লোকদের কাছে চার্চের যতোটুকু গ্রহণযোগ্যতা ছিল তা চিরতরে হারিয়ে গেল। সর্বাবস্থায় সত্যের উপর অটল থাকার ব্যাপারে চার্চের যে দাবি তা সে এভাবেই বিসর্জন দিল।

গ্যালিলিওকে সাজা দেওয়া হয় এবং তার বইগুলোকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; কিন্তু তাকে পরাজিত করা যায়নি। যে ধারণা তিনি রেখে গিয়েছিলেন তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়; আর এরই মাধ্যমে এরিস্টোটলিয়ান বিজ্ঞানচর্চা এবং চূড়ান্ত কারণ বা final cause অনুসন্ধানের ধারার ইতি ঘটে। সময়ের সাথে সাথে, বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বজগৎ এবং আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে সেসব ঘটনার আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে থাকলেন। রহস্যের জালে আবৃত যেসকল ঘটনা এতদিন ধরে ঈশ্বরের, ঈশ্বরদের কিংবা আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত অলৌকিক বিষয় বলে মানুষ মনে করত, দেখা গেল সেগুলোর খুব সহজ স্বাভাবিক ভৌতিক কোনো ব্যাখ্যা আছে।

ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গাটুকু ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকল। ১৮ শতকের দ্বারপ্রান্তে, আস্তিকতা বা theism এর স্থান দখল করে নিল deism। এ মতবাদে ঈশ্বরের ভূমিকা কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কারণ হিসেবে এবং তা কেবল মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক জগৎ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; দর্শনের ভাষায় যাকে বলা হয় First Cause।[৯] স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে ওয়াহ্‌য়ি বা প্রত্যাদেশ প্রেরণের ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। এ মতবাদে বিশ্বাসী, ১৮ শতকের বিখ্যাত deist দার্শনিক ভলটেয়ার প্রকাশ্যে ধর্মকে আক্রমণ করলেন। Deism এর ধারণা ক্রমান্বয়ে নাস্তিকতায় রূপান্তরিত হয় এবং তারা বলতে শুরু করেন যে, স্রষ্টা বা আল্লাহ ﷻ বলে কিছুই নেই। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউমের দৃষ্টিভঙ্গিও এমনই ছিল।[১০]

(৮) দ্য ট্রুথ ইন দা লাইট, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬।
(৯) দ্য ট্রুথ ইন দা লাইট, পৃষ্ঠা ২১৪।
(১০) গড দ্য এভিডেন্স, পৃষ্ঠা ৩৪।

www.pathagar.com

১৯ শতকের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ এবং সমাজের উঁচু শ্রেণির চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও প্রায় সকলেই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এরপরে যখন ইউরোপিয়ানরা ভূগোল ও জীববিজ্ঞানে ঐতিহাসিক উন্নতি সাধন করল তখন তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর এলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা। ১৯ শতকের প্রথম দিকেও অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে পৃথিবীর আদি ইতিহাস সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই তারা ওল্ড টেস্টামেন্টের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে একটি অনুসন্ধান দাঁড় করালেন। তারা বাইবেলিয় genealogy বা ক্রমবিকাশবিদ্যা থেকে পৃথিবীর বয়স হিসেব করলেন। নূহ ﷺ এর সময়ে যে প্লাবন হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করে তারা প্রমাণ করতে চাইলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এটি কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়, অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির হাত ছাড়া এমন আকস্মিক ও ক্ষণকালীন ঘটনা ঘটতে পারে না। এই তত্ত্বকে বলা হতো 'বিপর্যয়বাদ' বা catastrophism; কারণ এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এর মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩০ সালে চার্লস লাইলের লেখা 'Principles of Geology' বইটি বিপর্যয়বাদ তত্ত্বের অনুসারীদের দাবি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে এ তত্ত্বকে উড়িয়ে দিল। তিন খণ্ডের এই বইটিতে লাইল অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেন যে, বাহ্যত অতিপ্রাকৃতিক মনে হলেও স্বাভাবিক নিয়মবহির্ভূত এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রকৃতির নিয়মের আওতায় ঘটা খুবই সম্ভব। তার গবেষণায় আরও দেখালেন যে, বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবীর যে বয়স হিসাব করা হয়েছিল তার থেকে বাস্তব বয়স অনেক বেশি। [১১]

গ্যালিলিওর তত্ত্ব যেমন করে ক্যাথলিক চার্চের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছিল, তেমনি লাইলের ভূগোল মাথাব্যথারূপে আবির্ভূত হয়েছিল প্রোটেস্টান্ট চার্চের জন্য।[১২] ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির লোকেরা আবিষ্কার করলেন যে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মাঝে আদর্শিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত ইউরোপের এই চিত্র উঠে এসেছে ভিক্টোরিয়ান শাসনামলে ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় কবি আলফ্রেড টেনিসনের

(১১) দ্য ট্রুথ ইন দা লাইট, পৃষ্ঠা ২১৩।
(১২) গড দ্য এভিডেন্স, পৃষ্ঠা ৩৫।

www.pathagar.com

একটি লেখায়। তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে লেখা স্মরণিকায় তিনি প্রকৃতির এই নতুন রূপকে বর্ণনা করেন "রক্তাক্ত দাঁত এবং নখযুক্ত এক হিংস্র শ্বাপদ" (Red in tooth and claw) এর বিখ্যাত উপমায়।

এবার তরুণ ডারউইন লাইলের Principle of Geology বইটির ১ম খণ্ড সঙ্গে করে Voyage of the Beagle খ্যাত সেই সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। তিনি বাইবেলে বিশ্বাসী একজন খ্রিষ্টান হিসেবে তার যাত্রা শুরু করলেও, কিছুদিনের মাঝেই তিনি Agnostic বা অজ্ঞেয়বাদীতে[১৩] পরিণত হন। ১৮৫৯ সালে যখন তিনি তার বিখ্যাত বই 'The Origin of Species' প্রকাশ করেন তখন এটি যেন হাজির হলো ইউরোপের ধর্মবিশ্বাসের জন্য একটা মৃত্যু পরোয়ানা হিসেবে! এই বইটির মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান অবশেষে মানব প্রজাতি এবং অন্য সকল প্রাণীর জীবনের উৎপত্তির একটি সহজসরল ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সমর্থ হলো। নাস্তিকতার বিশ্বাসে যেন জোয়ার এনে দিলেন ডারউইন। বিশ্বজুড়ে এই ধারণা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। উল্লেখ্য, ১৯ শতকের বিখ্যাত নাস্তিক কার্ল মার্ক্স, তার লেখা 'দাস ক্যাপিটাল' বইটির ইংলিশ অনুবাদ ডারউইনের জন্য উৎসর্গ করেন। জার্মান সংস্করণে তিনি তার বইয়ের শুরুতে লিখেছেন, "চার্লস ডারউইনের গুণমুগ্ধ এক অনুরাগীর পক্ষ থেকে"।

এ পর্যায়ে বিজ্ঞান আবির্ভূত হলো 'সবজান্তা' চরিত্রে। সকল প্রশ্নেরই ভৌত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের মাঝে—এমনই একটি ধারণা জন্ম নিল পশ্চিমা সমাজে। এক পর্যায়ে ধর্মকে দাঁড় করানো হলো আসামির কাঠগড়ায়। অবশেষে ১৮৫৫ সালে সেই ঐতিহাসিক রায়টি দিলেন জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিটশে। দর্শন জগতে একটি নিষ্ঠুর রসিকতা হিসেবে পরিচিত তার সেই রায় হলো, "ঈশ্বর এখন মৃত"।[১৪]

ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—উভয়টিই মানবজাতির অস্তিত্বে আসার ব্যাপারটিকে নিছক প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে আর্থ-সামাজিক

(১৩) ব্রকা'স ব্রেইন, পৃষ্ঠা ৩০১-৩১১।
(১৪) গড দ্য এভিডেন্স, পৃষ্ঠা ৩৭।

www.pathagar.com

দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট থেকে। অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ বস্তুবাদের আলোকে এই দুটো তত্ত্ব মানুষের জীবনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছে।

ডারউইন তার 'The Origin of Species' বইটিতে বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ইত্যাদি Ape জাতীয় প্রাণীর সূচনা হয় কোনো সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে; যেভাবে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। এই প্রক্রিয়ার নাম তিনি দিয়েছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন', যা 'যোগ্যরাই টিকে থাকে' বা survival of the fittest নামে অধিকতর পরিচিত। এই সূত্র ধরে মার্ক্স মানব ইতিহাসের সকল ঘটনাকে ধনী-গরিবের মধ্যকার অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। তার মতে, সবকিছুই বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ নিয়ে সম্পদের কাড়াকাড়ি থেকে সৃষ্ট। এটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'শ্রেণি সংগ্রাম' নামে। তার কাছে যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে দুটো শ্রেণিতে বিন্যাস করা যাবে; প্রথমটি শাসক শ্রেণি এবং অপরটি শোষিত শ্রেণি। এভাবেই মার্ক্সবাদ অনুসারে ধর্ম হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা তারা সমাজে তাদের শাসনকর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখে। এ নাটকে ঈশ্বর হচ্ছেন এক কাল্পনিক চরিত্র, যে কি না কেবল ধনীদের বন্ধু। গরিবের উপর ধনীদের শাসনকর্তৃত্বের ছড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে পূর্বপরিকল্পিতভাবে, 'ভাগ্যের দোহাই' দিয়ে।

ডারউইনিজম

ডারউইন মনে করতেন, সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানরা অন্যদের তুলনায় বেশি 'উন্নত'। যদিও ডারউইনের ধারণা ছিল বানর-সদৃশ কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তন হতে হতে মনুষ্য প্রজাতির জন্ম, তথাপি তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যেই আবার কিছু কিছু নরগোষ্ঠীর বিবর্তন অন্যদের তুলনায় বেশি সংঘটিত হয়েছে; তাই তারা অন্যদের থেকে উন্নত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প-বিবর্তিত নরগোষ্ঠীর মধ্যে বানরের বৈশিষ্ট্য অধিকতর বিদ্যমান। ডারউইন তার 'The Decent of Man' বইয়ে (এটি প্রকাশিত হয়েছিল The Origin of Species এর পরে), সাদা-কালো বিভিন্ন

www.pathagar.com

নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিবর্তনের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পার্থক্যগুলো নিয়ে বেশ জোরালো আলোচনা করেছেন। (১৫)

> "কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নজাত এবং তুলনামূলক কম বিবর্তিত বিধায় অনুন্নত"—ডারউইনের এই চিন্তা ভিক্টোরিয়া-পূর্ববর্তী যুগে ব্যাপকতা লাভ করে, যা সাম্প্রদায়িকতাকে আরও উস্কে দেয় এবং এর মাধ্যমে প্রশস্ত হয় সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের পথ। ডারউইনের মতবাদ ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনীকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্যাসিফিকের বিস্তীর্ণ 'অনুন্নত' অঞ্চলগুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালনার একটা 'যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক' ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তারা সেসব অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সেখানকার জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। 'প্রগতিশীল' এ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে যে, তাদের এ দখলদারিত্বের 'মহান' উদ্দেশ্য হলো বিবর্তনের সিঁড়ির নিচের ধাপে পড়ে থাকা এইসব 'পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত' জাতিগুলোকে সভ্য ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। (১৬)

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র

আজকের দিনে পশ্চিমা সভ্যতার মূলমন্ত্র হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। পশ্চিমা জাতিগুলো এই আদর্শকে সর্বোত্তম ও সবার জন্য অনুসরণীয় মনে করে। যেহেতু পশ্চিমারা মনে করে যে, বর্তমান পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে উন্নত জাতি; কাজেই তারা যে জীবনব্যবস্থা বা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, সেটা সমগ্র মানবজাতির কাছেই উত্তম ও উন্নত বলে পরিগণিত হতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস যা সকল প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব

---

(১৫) হোয়াট ডারউইন রিয়েলি সেইড, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৬।

(১৬) জেফরি গুডম্যান এর "দ্য জেনেসিস মিস্ট্রি" (টাইমস বুক, ১৯৮৩) বইটি এই দাবির সপক্ষে উদ্ধৃত হয়েছে "ক্লিংগিং টু আ মিথ" বইয়ের নবম পৃষ্ঠায়।

www.pathagar.com

থাকতে পারবে না।[১৭] মধ্যযুগে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাগতিক বিষয়াদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং কেবল ধর্ম ও পরকালীন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। এ প্রবণতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রেনেসাঁ যুগে মানবতাবাদ বিকাশের দাবি নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আত্মপ্রকাশ করল।[১৮] তখন মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়ে পার্থিব উন্নতি ও বস্তুগত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসের পুরোটা জুড়ে তাই ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রযাত্রার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[১৯]

১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান সভ্যতায় এক অভিনব ব্যাপার ঘটতে থাকে। আর তা হলো মানুষের মনোবৃত্তি, স্পৃহা এবং চিন্তা-চেতনার ধর্মনিরপেক্ষীকরণ। ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার ফলে তখন এমন সব ধারণা জন্ম নিতে থাকে, যা ধর্মতত্ত্বকে হার মানায় এবং অনেক চিন্তাশীল মানুষের মনেও মুগ্ধতার জন্ম দেয়।[২০]

মধ্যযুগের শেষ দিকে মানুষ, মানুষের বোধশক্তি, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বস্তুগত ভোগ-বিলাস সুখ-সমৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা ব্যাপকতা লাভ করে। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভোগ-বিলাস-বিমুখতা লোপ পায়। সবকিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করার ব্যাপারটি আর গ্রাহ্য করা হতো না। কারণ ইউরোপ তখন নতুন যে বাস্তবতায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে তার সাথে ধর্মের বিস্তর ফারাক। সমাজে তখন আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছে, শহরের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে নতুন আঙ্গিকে। যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার লাগাম ইতিপূর্বে ছিল খ্রিস্টান পুরোহিততান্ত্রিক যাজকশ্রেণি এবং সামন্তবাদী জমিদারদের হাতে, তা এখন স্থানান্তরিত হলো শহরের পুঁজিপতিদের হাতে।[২১]

---

(১৭) দ্য লিভিং ওয়েবস্টার এনসাইক্লোপিডিয়া ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃষ্ঠা ৮৬৯।

(১৮) মানবতাবাদ শব্দটির উৎপত্তি "স্টাডিয়া হিউম্যানিস্টস" (মানবতাবাদের অধ্যয়ন) থেকে।

(১৯) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ৫৯৪) ।

(২০) প্রাগুক্ত, ভলিউম ২০, পৃষ্ঠা ৫৬৯।

(২১) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১৮, পৃষ্ঠা ২৭।

www.pathagar.com

'প্রকৃতির নিয়ম' সম্বন্ধে গ্রিকরা যে ধারণা পোষণ করত তা স্টয়িক দর্শনের মাধ্যমে আরও পরিশীলিত হয়। স্টয়িক দর্শনমতে, প্রতিটি মানুষের মাঝে যে সহজাত যুক্তিবোধ আছে, তা সুবিন্যস্ত বস্তুগত বিশ্বজগতের সাথে প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে এবং সকলকে একটি সর্বজনীন নৈতিক বিধানে আবদ্ধ করে। স্টয়িক দর্শনের এই ধারণাটি সর্বতোভাবে রোমান চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে।

মধ্যযুগে হিপ্পোর সেন্ট অগাস্টিন অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত ঐশী বিধানের পেছনে সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে ঈশ্বরের ইচ্ছের পাশাপাশি ঈশ্বরের যুক্তিকেও দাঁড় করিয়েছেন। ফলে এ বিধান একই সাথে মানুষের বিশ্বাসের পাশাপাশি বিবেচনাবোধের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়, যা সেন্ট পলের মতের বিপরীত। সেন্ট পল মূলত যা বলতে চেয়েছেন তা হলো যে, এই ঐশী বিধান শুধুই ঈশ্বরের ইচ্ছের ফল, তাকে কখনোই মানুষের যুক্তিবোধে আঁটানো যাবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে অগাস্টিন রেখেছেন তথৈবচ অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক বিধানকে, যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এমন ঐশী বিধান হিসেবে যা মানুষ তার যুক্তিবোধ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তৃতীয় সারিতে রয়েছে সাময়িক বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রণীত বিধান যা ঐশী বিধান দ্বারা অনুমোদিত এবং যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল ঐশী বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়মকে সে লঙ্ঘন না করছে এই অনুমোদন ততক্ষণ বলবৎ থাকবে।

ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও তার 'ইবাদাহ। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শারী'আহ্‌র আইনের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান বা আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা একটি চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুর'আনে উল্লিখিত আছে।

www.pathagar.com

"যারা আল্লাহ ﷻ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" [আল-মা'ইদাহ, ৫:৪৪]

দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণেই জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে। ইসলামি বিশ্বাস হলো, মানুষকে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টি করেছেন তাঁরই 'ইবাদাতের জন্য। দুনিয়ায় তার ক্ষণকালীন জীবনটি সে স্রষ্টার বিধানমতে সৎভাবে যাপন করবে, যাতে পরকালীন জীবন সে সুখে কাটাতে পারে। ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যমে 'ইবাদাহর যে পন্থা নির্দেশিত হয়েছে তা মানুষকে সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। এ ব্যবস্থায় মানবজীবনের সকল ব্যাপারেই দিকনির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতির আর অন্য কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে কোনো কিছু ধার করার প্রয়োজন নেই। তাদের গোটা জীবনই ওয়াহ্‌য়ির আলোকে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

"বলুন, আমার সলাত, আমার ত্যাগ, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।" [আল-আন'আম, ৬:১৬২]

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি ফসল মাত্র। জীবজন্তুর মতো তারও জীবনের তেমন বিশেষ কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ব্যাপারটা এক কথায় এমন, 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করো, আগামীকাল বাঁচবে কি না কে বলতে পার'। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে, ধর্ম মানুষকে জীবন উপভোগ করতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই, ধর্মের পুরো ব্যাপারটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজেদেরকে 'রঙিন দুনিয়া' থেকে গুটিয়ে রাখতে চায় রাখুক, তবে বাকিরা যেভাবে খুশি সেভাবে জীবন যাপন করতে পারবে, ধর্মের সেখানে নাক গলানো চলবে না।

প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের মানসিকতা স্বাধীনতার নামে কুপ্রবৃত্তির শেকলে শৃঙ্খলিত হওয়া বৈ কিছুই নয়। কারণ এ এমন এক জীবনদর্শন, এখানে মানুষ যা কিছুকে 'স্বাধীনভাবে বাছাই' করে নেয়, বাস্তবিকপক্ষে তার গোলামির জিঞ্জিরেই সে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। যে প্রক্রিয়ায় এই বাছাই করার কাজটি সম্পন্ন হয় তা-ই হচ্ছে গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের নাম এবং ধারণা- দুটোরই উদ্ভব ঘটেছে প্রাচীন গ্রিসে, যার অর্থ 'জনগণের শাসন'। প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষত এথেন্সে, দাস এবং নারীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হতো না। কার্যত অধিবাসীদের ২০ থেকে ৩০ ভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল সক্রিয় নাগরিক।[২২] বর্তমান পশ্চিমা গণতন্ত্রের বাস্তবতাও খুব ভিন্ন কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাসনকর্তৃত্ব বর্তমানে তার চেয়েও ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। 'শাসনকার্যে আমাদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে'- জনগণের মনে এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতেই কেবল পশ্চিমারা নির্বাচন নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। অত্যন্ত সুকৌশলে তারা সাধারণ মানুষকে শাসনব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখে। যেমন, অ্যামেরিকার মতো দেশে সরকার যেখানে অন্যান্য অনেক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, সেখানে সকল স্তরের শিক্ষা একারণেই বিনামূল্যে দেওয়া হয় না যে, সাধারণ শ্রেণির কেউ যেন সহজে সরকারব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে না পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা খুবই ব্যায়বহুল হওয়ার কারণে নিম্ন শ্রেণি থেকে আসা লোকদের বেশিরভাগই নিজেদের অবস্থা উত্তরণে ব্যর্থ হয়। তথাপি, দেখা যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ভর্তুকিযুক্ত আবাসনের পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। অথচ হাইস্কুলের গন্ডি পেরোতেই বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি এজন্য নয় যে, অ্যামেরিকান সরকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম; বরং এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা, যেন শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণির উপর অল্পশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন ধরে রাখা যায় এবং তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে রাখা যায়। অথচ, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে আক্রান্ত সুদানের মতো একটি দরিদ্র দেশও বিনামূল্যে শিক্ষার আর্থিক যোগান দিতে সমর্থ হয়েছে।

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে, গণতন্ত্র নেহায়েত কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ এবং দর্শনও বটে। তারা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষের সাথে ঘোষণা দেন, "পশ্চিমা গণতন্ত্র

(২২) কলিয়ার্স ডিকশনারি, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ৮০।

www.pathagar.com

সরকারব্যবস্থার গণ্ডি পেরিয়ে মানবীয় সম্পর্কের সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।"[২৩]

জীবনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রথমটি হলো সাম্যবাদ। যুক্তিবাদী মানবতাবাদের বিচারে, গোষ্ঠী, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাত এবং ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে; আর সেটি হচ্ছে যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।[২৪] গণতন্ত্রের এই নীতিটি ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক নয়। তবে ইসলামে সে সাম্যের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর উপর ঈমান। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"প্রতিটি শিশু তার ফিতরাত বা স্বভাবজাত বিশ্বাসের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[২৫]

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক অভিজ্ঞতাবাদ। এ তত্ত্ব অনুসারে মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং মানবীয় যুক্তিই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানবসমাজের জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের আছে; এ জন্য কোনো ঐশ্বরিক বিধানের প্রয়োজন নেই। যদিও বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক অ্যামেরিকার সংবিধানের কথা, যেটি প্রণীত হয়েছিল ১৮ শতকের সেরা চিন্তাবিদ এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের হাতে। এই সংবিধানে এমন একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেটি একেবারে আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। অনুচ্ছেদ ১, 'তিন-পঞ্চমাংশে মীমাংসা' (The Three-Fifth Compromise) শীর্ষক ২য় খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গকে (তৎকালীন সমাজে যারা দাস শ্রেণিভুক্ত ছিল) একজন শ্বেতাঙ্গের তিন-পঞ্চমাংশ হিসেবে ধরা হবে।[২৬] এই সংবিধানের রচয়িতাদের সকলেরই

---

(২৩) এই মতবাদ অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের কারণ অনুসন্ধান এবং প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে যে ধরনের যুক্তিবিদ্য প্রয়োগ করা যায়, তেমনি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা এবং আচার বিশ্লেষণেও একইরূপে যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(২৪) কলিয়ার্স ডিকশনারি, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ৭৭।

(২৫) সহীহ আল-বুখারি ও সহীহ মুসলিম।

(২৬) যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৮৭ সালের সংবিধানে ১ম অনুচ্ছেদের ২য় ধারায় উল্লেখ আছে, "ইউনিয়নভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে প্রতিনিধি এবং কর বন্টন হবে তাদের সংখ্যার উপর

www.pathagar.com

ক্রীতদাস ছিল এবং তারা তাদেরকে নিজেদের সমতুল্য মনে করতেন না। ফলে, সংবিধানে তারা স্রেফ নিজেদের কিংবা সমাজের প্রভাবশালীদের বিশ্বাস এবং ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। তারা যেটাকে সঠিক বলে মনে করতেন সেটাকেই পরম সত্য ও ন্যায় বলে বিবেচনা করলেন। কোনটি আসলে ন্যায়, আর কোনটিই বা অন্যায়, মানবীয় যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলো না। ইউরোপ, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার ইতিহাসে প্রচলিত আইনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ আমাদের সামনে যে বাস্তবতা তুলে ধরে তা হলো, মানুষ যখন আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন সে তার সম্প্রদায়, শ্রেণি কিংবা মহলের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই আইন প্রণয়ন করে। তারা কখনোই সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত হতে পারে না।

অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান আল্লাহ ﷻ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত। কোনো বিশেষ শ্রেণির সাথে তাঁর কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই; কাজেই একমাত্র তিনিই পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ ন্যায্য আইন প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা রাখেন। মানুষের ভূমিকা কেবল স্রষ্টার এই আইনের বাস্তবায়নে এবং সে আইনের মূলনীতির আলোকে গৌণ কোনো বিষয়ে নিয়ম-নীতি নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গণতন্ত্রের তৃতীয় মূলনীতিকে অভিহিত করা হয় 'Discussion and consent' বা 'আলোচনা এবং অনুমোদন' শীর্ষক শিরোনামে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ধারণার উপর 'আলোচনা' নামক মূলনীতিটি দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, পরম সত্য বলে কিছু নেই; কাজেই সকল মতকেই আলোচনায় স্থান দিতে হবে। প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করা যাবে না।[২৭] সকলের

ভিত্তি করে। এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে নিম্নলিখিত উপায়ে: বিভিন্ন মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিসহ মোট স্বাধীন মানুষের সংখ্যা থেকে করের আওতাভুক্ত ইন্ডিয়ানদের বাদ দেওয়া হবে এবং অন্য সকল মানুষের তিন-পঞ্চমাংশ যোগ করা হবে।" উৎস: অ্যামেরিকান গভার্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস: ১৯৮৮-২০৩-০১৭/৮০০০২।

(২৭) কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ৭৭।

www.pathagar.com

মত প্রকাশ করার পর, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য পরিণতি হলো, এখানে সত্য-মিথ্যা সবকিছুই আপেক্ষিক হয়ে যায়, পরম সত্য বা মিথ্যা বলে আর কোনো কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। আজ যেটাকে ভালো মনে করে গ্রহণ করা হয়, সেটি হয়তো কাল খারাপ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এর উল্টোটাও হতে পারে! এই ধরনের দর্শনের প্রভাবে একটি সমাজে নৈতিকতার শাশ্বত ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'Catcher in the Rye' নামক যে বইটি এক সময় পর্নোগ্রাফির অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই বইটিই এখন কানাডার হাইস্কুলে পড়ানো হয়। যে ধরনের ছবি ষাটের দশকে 'Playboy' ম্যাগাজিনে ছাপা হওয়ায় সেটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ছড়াবার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, সেই একই ধরনের নগ্ন কিংবা প্রায় নগ্ন ছবি ১৯৭৬ সাল থেকে মূলধারার ব্রিটিশ পত্রিকা 'The Sun' তার প্রতিটি প্রকাশনার ৩য় পৃষ্ঠায় নিয়মিত ছাপা আরম্ভ করে; অথচ কেউ কোনো টুঁ শব্দটিও করেনি।

এরকম আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে; যখন পশ্চিমে সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের কোনো গড়পড়তা অধিবাসীকে যদি সমকামিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো; তবে তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠত, এটা অসুস্থ, বিকৃত এবং কুরুচিপূর্ণ! কিছুটা ধার্মিক প্রকৃতির লোক হলে হয়তো বাইবেল থেকে এর নিষিদ্ধতা বিষয়ক উদ্ধৃতি করে বলত, *"an abomination unto the Lord"*। সে যুগের মনোরোগ চিকিৎসাবিদগণ সমকামিতাকে চিহ্নিত করেছেন 'মানসিক অসুস্থতা' হিসেবে এবং এ রোগের প্রতিকারস্বরূপ শক থেরাপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের পথ বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু সত্তর বা আশির দশকের দিকে এসে তাদের মনমানসিকতা পাল্টে গেল, বদলে গেল তাদের জবাবের ধরন প্রকৃতি—'সমকামিতা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার', 'এটা তো কেবল একটা ভিন্ন রকম লাইফস্টাইল', 'different strokes for different folks'। অবশেষে একটা সময় আসল যখন মনোরোগবিদদের ডিকশনারি থেকে 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' শব্দটি হারিয়ে গেল, আর তার স্থান দখল

www.pathagar.com

করল 'হোমোফোবিয়া'। পরিস্থিতি এবার এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকল, যে বা যারা সমকামিতা বা সমকামী ব্যক্তিকে ঘৃণার চোখে দেখবে, তাদের নাম দেওয়া হলো 'হোমোফোবিক'; এবার তাদেরকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো মনোরোগ চিকিৎসকের চেম্বারে। গণতান্ত্রিক নীতির নামে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার এহেন লাগামহীন পরিসরে পশ্চিমা সভ্যতা এভাবেই ছুটে বেড়িয়েছে চরম সীমার এক মেরু থেকে অপর মেরুতে।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক জুড়ে পশ্চিমা দেশগুলো এক ভয়াবহ যৌন লালসার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যার পরিণাম গিয়ে ঠেকে পশ্চিমা বিচারব্যবস্থায় ইতিপূর্বে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য ব্যভিচার এবং বৈবাহিক সম্পর্কবহির্ভূত যৌনসম্পর্ককে আইনগত বৈধতা প্রদানে। আধুনিক যুগের পশ্চিমা আইন প্রণেতারা হিসাব-নিকাশ করে এই উপসংহারে এসে পৌঁছলেন যে, 'বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে ম্যারিজ সার্টিফিকেট নামের একটুকরো কাগজ ছাড়া আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণেই এখানে 'পারস্পরিক সম্মতি' সত্ত্বেও যৌনতাকে অবৈধ ভাবা হচ্ছে'।

সেসময়ের আইন প্রণেতারা বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্কের বৈধতা নিরূপণে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করলেন। ধর্ষণ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার; তাই তারা আইনটিকে সাজালেন এভাবে যে, উভয়পক্ষের 'সম্মতি' থাকলেই যেকোনো যৌন সম্পর্ক বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো শিশুর সাথে যৌনসম্পর্ক (pedophilia) স্থাপন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা শিশুদের অপরিপক্কতার সুযোগ নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এ আইনের অপব্যবহার করতে পারে। এ কারণে তারা এ ধরনের যৌনসম্পর্কের বৈধতা প্রদান করতে 'সাবালকত্ব'(adulthood) নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করলেন। 'Consenting adult' বা 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' [২৮] স্লোগানটি পুরো

(২৮) "গত কয়েক বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, ইউরোপ এবং অ্যামেরিকার অনেকগুলো নামকরা আইনি, মেডিক্যাল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমকামিতা নিয়ন্ত্রণের পুরো বিষয়টিতে বিচার বিবেচনা করে সকলে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং নাগরিক জীবনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন প্রণয়ন করা উচিত, এবং যেসব আইনের ভিত্তি কেবলই নৈতিক সেগুলো বাদ দেয়া উচিত। এটাও উল্লেখ্য,

www.pathagar.com

পশ্চিমজুড়ে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অবাধ যৌনতার বাধভাঙা জোয়ারে ভাসল তারা। নিজেদের মধ্যে স্ত্রী অদলবদলের পার্টি (wife swapping) থেকে শুরু করে দল বেঁধে যৌনমিলন, ধর্ষকামিতা, টপলেস বার কালচার- ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনাচার ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিমাদের মাঝে।

ষাটের দশকে পশ্চিমাদের জীবনে যৌনতার যে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সাথে সমান তালে চলতে থাকে নাগরিক অধিকার আন্দোলন, পশ্চিমা বিশ্বে যা Civil Rights Movement নামে পরিচিত। কৃষ্ণাঙ্গ অ্যামেরিকানদের উপর আরোপিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা রাস্তায় নামে। অ্যামেরিকার অনেক শহরে ব্যাপক জ্বালাও পোড়াও করা হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যামেরিকান কর্তৃপক্ষ এ সাম্প্রদায়িক বৈষম্য নির্মূল করতে আইনগত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। তারা অ্যামেরিকার সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের আইনগত বৈধতা প্রদান করে। এই মানবাধিকার আন্দোলনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নারী অধিকার আন্দোলন। যেহেতু মানবাধিকার আন্দোলনেও তাদের বিরাট অবদান ছিল, তাই আন্দোলন কীভাবে করতে হয় তা তাদের ভালোই জানা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে এই আন্দোলনেরও হিসেবে ছিলেন একজন নারী, যার নাম রোসা পার্ক, যিনি ১৯৫৫ সালে অ্যালাবামা প্রদেশের মন্টগোমারিতে একটি বাসে পেছনের সিটে বসতে অস্বীকৃতি জানান। সেই ঘটনার সূত্র ধরে আন্দোলনটি নতুন মাত্রা লাভ করে কিংবা ঘটনাটি আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে।[২৯] পুরুষদের সমান পারিশ্রমিকের দাবিতে মহিলারাও আন্দোলন শুরু করেন। একই সাথে যেসব পদ প্রথাগতভাবে পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল সেসব পদে নারীদের আসীন করার দাবিতেও তারা আন্দোলন করতে থাকেন।

নারী অধিকার আন্দোলনটি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। সংবিধানে নারী অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এর পথ ধরে সমকামীরা দেশব্যাপী তাদের সাথে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

সম্মতির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যক্তিগত জীবনে যেকোনো প্রকার যৌন সম্পর্কের উপর কোনো আইনগত নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।" (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ২৭, পৃষ্ঠা ২৪৭)

(২৯) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৯।

www.pathagar.com

বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের দাবিতে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। সে সময়ে কিছু কিছু পদে সমকামীদের নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথাগত ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে অনেকেই রাস্তায় নেমে পড়ল সমকামীদের অধিকার আদায়ের দাবিতে। কিন্তু আইন প্রণেতারা এ দাবির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান; তারা বলেন, সমকামিদেরকে কোনোক্রমেই আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। অ্যামেরিকান সমাজ তার জন্ম থেকেই এমন ধরনের কার্যকলাপকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। কিন্তু সমকামীরা এবার যৌনবিপ্লবের মূল স্লোগান 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' নীতির ভিত্তিতে দাবি তুলল যে, সমকামিতাও হতে পারে যে কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা। প্রকাশ্যে তারা চ্যালেঞ্জ করল সমাজের মূল্যবোধকে। আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে তারা এই বিতর্কে অবতীর্ণ হলো যে, সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক এ আচরণের পেছনে একমাত্র দায়ী হলো ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, আর একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম কখনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অবশেষে, আইন প্রণেতারা নিজেদের যুক্তির কাছে নিজেরাই হার মানলেন, সংবিধানে সমকামীদের অধিকার স্বীকৃত হলো।

দুর্ভাগ্য সবে কেবল শুরু। কয়েক বছর আগে সুইডেনে 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' নীতিকে কাজে লাগিয়ে অজাচারের (পরিবারের মাহ্‌রাম সদস্যদের মধ্যে যৌনসংসর্গ) মতো একটি বিষয়কেও আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ফলে কোনো ব্যক্তি চাইলে তার মা, বোন কিংবা তার কন্যার সাথে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে; কেবল তারা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং এ কাজে সম্মত হলেই হয়; এটা ছাড়া এই পশুসুলভ নিকৃষ্ট কাজে তাদের আর কোনো আইনগত বাধা নেই।

অন্যদিকে, ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আইনই হলো সর্বোচ্চ এবং অপরিবর্তনীয় আইন। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ ﷻ যেটাকে মন্দ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ইসলামি নৈতিকতার বিচারে তা সবসময় মন্দ হিসেবেই বিবেচিত হবে; কখনোই তা উত্তম বিবেচিত হবে না। কারণ মানবজাতি এবং মানবসমাজের মৌলিক যে প্রকৃতি তাতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং তা হওয়া সম্ভবও নয়। নৈতিকতার একটি দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে মানবসমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আর যদি মানুষের হাতে নৈতিকতার ভিত্তি গড়ার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলছেন,

"সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে আসমানসমূহ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যবর্তী যা কিছু সবই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।"

[আল-মু'মিনূন, ২৩:৭১]

কাজেই, সমকামিতাকে জিনগত কিংবা জৈবিক দিক থেকে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার জন্য যতই 'বৈজ্ঞানিক' সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হোক না কেন, ইসলাম তাকে একটি চরম গর্হিত অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করবে, যেভাবে ব্যভিচারকে গণ্য করে। ইসলামি আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থমস্তিষ্কের ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত এবং কর্মের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী। মানুষ কোনো রোবট নয় যে, পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামিং এর বাইরে তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আজকাল কিছু বিজ্ঞানী এমনও দাবি করছেন যে, ডাকাতি বা খুন করার মতো অপরাধগুলোও অপরাধীর জিনের সাথে সম্পর্কিত। যে প্রশ্নটি তখন থেকে যায় তা হলো, যদি বিজ্ঞানীরা কখনো প্রমাণ করেন pedophilia বা শিশুদের সাথে যৌনাচার, ধর্ষণ এগুলোও জিনগত ব্যাপার, তখন কি পশ্চিমা সমাজ এই অপরাধগুলোরও বৈধতা প্রদান করবে? তখন তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত তত্ত্ব 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি'কে বাতিল বলে ঘোষণা দেবে?

আইন রচনায় মানুষের ভূমিকাকে ইসলামি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয় না; বরং তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়। মানুষের এ অধিকার সীমিত থাকবে গৌণ বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত আইনের মধ্যে, মৌলিক বিষয়াদিতে এ অধিকার প্রয়োগ চলবে না। কুর'আনের "আর তাদের কাজকর্ম হয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে", এই আয়াতে যে পরামর্শমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে পশ্চিমা গণতন্ত্রের যে ভূমিকা আছে তা একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি এমন হয় যে, কোনো এলাকার একটি ব্যস্ত সড়কে প্রায়শই যানবাহনের দুর্ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সে সড়কে একটি ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো যেতে পারে; এসব ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আছে।

www.pathagar.com

প্রয়োজনবোধে তারা পরে এই সিগন্যালটি আবার সরিয়েও ফেলতে পারে, সেটির উপযোগিতা বিবেচনা করে।

গণতন্ত্রকে বিকিয়ে দিয়ে হলেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পশ্চিমা সভ্যতা। এ ধরনের মনোভাব গণতান্ত্রিক পশ্চিমা শক্তি কর্তৃক তুরস্ক এবং আলজেরিয়ার অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসনকে সমর্থন যোগানোর নেপথ্য কারণ ব্যাখ্যা করে। তুরস্কের এক সময় নারীদের হিজাব পরিধানের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। মার্ভে সেফা কাভাকি নামক তুরস্কের একজন সংসদ সদস্যা এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে সাংসদদের শপথ পাঠের অনুষ্ঠানে হিজাব পরে উপস্থিত হলে জোরপূর্বক তাকে বের করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' একটি গণতান্ত্রিক নীতি, যা একজন নারীকে হিজাব পরার স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু এরপরেও পশ্চিমারা তুরস্কের এ ধরনের দমননীতির প্রতি পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে; এর একমাত্র কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তুরস্কের একনিষ্ঠতা। একইভাবে, যখন আলজেরিয়ান সেনাবাহিনী ইসলামপন্থী দল এফ.আই.এস এর গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভের পর তাদের সরকার প্রতিষ্ঠা রোধকল্পে সে নির্বাচনের ফল বাতিল ঘোষণা করে, তখনো পশ্চিমা শক্তি এই অগণতান্ত্রিক ঘটনাটিকে দেখেও না দেখার ভান করে। মুখে যদিও পশ্চিমারা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ধরে রাখা তাদের কাছে গণতন্ত্রের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চীন এবং ভারত উভয় দেশেরই জনসংখ্যা শত কোটির উপরে; তারাও পশ্চিমা সভ্যতার পথই অনুসরণ করেছে। মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চীন যখন সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তখন তারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে মেনে নেয়। সমাজতন্ত্র ছিল কেবল পুঁজিবাদের বিকল্প একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। মার্ক্স, লেনিনরা সমাজতন্ত্রের যে মূল দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন তার সারকথা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। প্রোলেতারিয়েত বা শ্রমিক ও কর্মজীবী সম্প্রদায়ের যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক, তারাই হবে সমাজের প্রকৃত শাসক এবং সেটা হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির হাতেই ছিল শাসনক্ষমতা। তারা প্রোলেতারিয়েতদের নামে

www.pathagar.com

শাসন করত ঠিকই, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের স্বার্থ সেখানে সংরক্ষিত হয়নি। কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ধর্মবিদ্বেষ পুঁজিবাদী দেশ থেকেও মারাত্মক উগ্র ও প্রবল। নাস্তিকতা সেসব দেশে রাষ্ট্রধর্মের স্থান দখল করে নেয় এবং ধর্মগুলোকে সুকৌশলে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

অপরদিকে রয়েছে ভারত, মুসলিম সংখ্যালঘুসহ যার জনসংখ্যা প্রায় একশ কোটিরও বেশি; আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে তারাও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরেছে। যেকোনো বিচারেই হিন্দুত্ববাদ হচ্ছে অনেকগুলো ধর্ম এবং হুজুগে দল-উপদলের বিরোধপূর্ণ সংমিশ্রণ। পৃথিবীকে দেবার মতো তেমন কোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই তাদের নেই। হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে বুলি বিজেপি আওড়ায় তা নিছক হিন্দুত্ববাদের সাংস্কৃতিক অংশটিরই ভিন্ন এক রূপ। এই দলের সমর্থকরা দাবি করে সনাতন ঐতিহাসিক বিবেচনায় মুসলিমরাও হিন্দু এবং তাদের উচিত তাদের সনাতন ধর্মের আদি পরিচয়ে ফেরত আসা।

শেষ পর্যন্ত তাই পশ্চিমা সভ্যতা এবং তাদের সংস্কৃতির একমাত্র এবং সত্যিকার বিকল্প হিসেবে টিকে থাকে ইসলামি সভ্যতা। ইসলামি সভ্যতা অত্যন্ত মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দুটো সভ্যতার মাঝে কোনো মিল নেই। পশ্চিমা সভ্যতার অর্জনের খাতায় এমন অনেক ভালো কিছু আছে যার দ্বারা আজ মুসলিমরা উপকৃত হতে পারে, যেমনভাবে পশ্চিমা সভ্যতা বিগত যুগে মুসলিমদের অনেক অর্জন থেকে উপকৃত হয়েছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেওয়াজ-প্রথার জালে বাঁধা পড়া ইসলাম

পশ্চিমারা যদিও জানে যে, একমাত্র ইসলামি সভ্যতাই পারে তাদের প্রভাব ও আধিপত্যের উপর টেক্কা দিতে, কিন্তু তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য হলো, মুসলিম জাতি আজ পশ্চিমা বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনেকটাই অক্ষম। একথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বেশ সফল এবং যৎসামান্য প্রতিরোধ তাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে, তা-ও অত্যন্ত সুকৌশলে তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফলে, ইসলামি সভ্যতাকে পশ্চিমা সভ্যতার কার্যকর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। আর একারণে আল্লাহ ﷻ মুসলিম জাতির উপর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব পালনও সম্ভব হয়ে উঠছে না। এ দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলছেন,

"তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে গোটা মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

[আ-লি 'ইমরান, ৩:১১০]

পশ্চিমা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে না পারার মূল কারণ হলো, বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা থেকে মুসলিম জাতির দূরে সরে যাওয়া। ইসলামের আদর্শ-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন রকম কুসংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা ও আঞ্চলিক প্রথার অনুপ্রবেশের কারণে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে কোনটি সত্যিকার ইসলাম আর কোনটি কুসংস্কার ও স্থানীয় প্রথা, তা নির্ণয় করাই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

www.pathagar.com

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে ধাঁচের ইসলাম পালন করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হলো নিছক 'কালচারাল' বা 'ফোক ইসলাম'।[১] বাংলায় অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'প্রথাগত ইসলাম'। অথচ ব্যাপারটি 'প্রথাগত ইসলাম' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'ইসলামি প্রথা'। এই ধাঁচের ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো স্থানীয় রেওয়াজ-প্রথার অন্ধ অনুসরণ। বর্তমান যুগের মুসলিমদের মধ্যে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান তার অধিকাংশই হলো নিছক পূর্বপুরুষদের সূত্রে পাওয়া কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। প্রচলিত এসব রেওয়াজের মধ্যে খাঁটি ইসলামি প্রথা যেমন আছে, তেমনি এমন অসংখ্য প্রথাও আছে যেগুলোর সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্কই নেই। সামাজিক রেওয়াজ-প্রথার জালে বাঁধা পড়া অধিকাংশ মুসলিমরাই এ দুটোর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম নয়। একারণে তারা অনেক জাহিলি রেওয়াজকেও ইসলামের রীতিনীতি হিসেবে গণ্য করে ফেলে। তাই দেখা যায় যে, এগুলোর কোনোটির ব্যাপারে কোনো রকম আপত্তি জানালে সাধারণ জনগণ মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়।

মৌখিকভাবে সকল মুসলিমরা যদিও স্বীকার করে যে, ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো কুর'আন এবং সুন্নাহ,[২] কিন্তু তাদেরকে সঠিক অর্থে কুর'আন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হলে তারা নানা অজুহাত দিতে আরম্ভ করে দেয়। সবচেয়ে বেশি যে কথা বলা হয় তা হলো, "আমাদের অঞ্চলে এ ধরনের নিয়মের প্রচলন নেই"। এ ধরনের অসাড় যুক্তিতেই এসব মুসলিমদের মগজধোলাই হয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে যদি তারা কোনো আচার-প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাহলে মুরব্বিরা এই বলে তাদেরকে তিরস্কার করে যে, "তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু কাজটিকে ভালো মনে করেছেন, সেহেতু তোমাদেরও এটা করা উচিত," অথবা, "তুমি কি মনে করো তোমাদের বাপদাদারা সবাই ভুল ছিল?" মাক্কার মুশরিকদেরকে যখন ইসলামের দিকে আহ্বান করা হতো, তারাও একই রকম কথা বলত! আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলছেন,

"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে আসো', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি

(১) এমনকি খ্রিস্টান মিশনারীরাও এ ইসলামকে এ নামেই অভিহিত করে থাকে।

(২) রসূল ﷺ এর কথা, কাজ এবং মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ্ বলা হয়।

www.pathagar.com

তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' তাদের পিতৃপুরুষদের যদি কোনো বো-বুদ্ধি না থাকে কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয় তবুও?" [আল-মা'ইদাহ, ৫:১০৪]

মুসলিমরা যদি তাদের সভ্যতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের জীবনব্যবস্থাকে পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প হিসেবে প্রমাণ করতে চায়, তাহলে সংস্কৃতি কিংবা আচার-প্রথা নামক এ জাহেলি জঞ্জালকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কারণ পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা কেবল বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ইসলামেরই আছে।

আচার-প্রথার নামে ইসলামের সাথে যেসব অনৈসলামিক রীতি-রেওয়াজ মিশে আছে সেগুলো প্রধানত চার প্রকার।

১. প্রাক-ইসলামি প্রথা

২. ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে গৃহীত প্রথা

৩. ধর্মের নামে নবোদ্ভাবিত মনগড়া প্রথা ও কথা

৪. ধর্মীয় দলাদলি থেকে উদ্ভূত প্রথা।

১. প্রাক-ইসলামি প্রথা

ইসলাম যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন কিছু লোক তাদের ইসলামপূর্ব আচার-প্রথা সাথে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করল। ইসলামি আইন তার শাসনাধীন জনগণের সকল আচার-প্রথাকে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। 'উরফ' নামক একটি বিশেষ ধারার আওতায় স্থানীয় আচার-প্রথাগুলোকে এই শর্তে স্থান দেওয়া হয় যে, সেগুলো দীন ইসলামের কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। এসব অনৈসলামিক আচার-প্রথার মাত্রা অঞ্চলভেদে নানা রকম হতো; কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। অনেক ক্ষেত্রে এটা নির্ভর করত ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং তাদেরকে যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন তাদের জ্ঞানের তারতম্যের ওপরে। ইসলামি শিক্ষায় যারা যত পিছিয়ে ছিলো, প্রাক-ইসলামি চর্চায় তারা তত বেশি লিপ্ত ছিল। একইভাবে যারা তাদেরকে ইসলামের

www.pathagar.com

শিক্ষা দিতেন, তারাও অনেক সময় বিভিন্ন কারণে কিছু অনৈসলামিক আচার-প্রথার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারত-পাকিস্তান অঞ্চলের অনেক মুসলিমদের দেখা যায়, বিয়ের সময়ে হিন্দুদের অনুকরণে কনেকে লাল শাড়ি পরায়। ইসলামি সংস্কৃতিতে কনের পোষাকের জন্য বিশেষ কোনো রঙ নির্ধারণ করা নেই। তবে ইসলামের একটি সাধারণ বাধ্যবাধকতা হলো, মুসলমানদের কোনো কিছুই বিধর্মীদের অনুকরণে হতে পারবে না। এ কারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত সাদা কিংবা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত লাল রঙ-এর বিয়ের পোষাক ব্যবহার করা যাবে না।

আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের রেওয়াজগুলোকে ক্ষতিকর কিছু মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। তবে এসব আচার-প্রথার মধ্যে এমনসব বিষয়ও রয়েছে যেগুলো একই সাথে শারীরিকভাবে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি আদর্শ-বিশ্বাসের সাথেও সাংঘর্ষিক। যেমন, ফারাওনিক খৎনা বা যৌনাঙ্গহানি করার প্রথা।[৩] পূর্ব আফ্রিকা, সুদান এবং মিশরের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অনেকের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত আছে। প্রথাগতভাবে আগত অনৈসলামিক রীতির এটি একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। এটা মহিলাদের জন্য শারীরিকভাবে এমন ক্ষতিকর, যা বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে; এমনকি এটা একজন নারীর মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে করানো হলেও, তা একজন নারীকে বৈবাহিক জীবনের শারীরিক তৃপ্তি থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত করে। অধিকন্তু, এ প্রথার সাথে ইসলামকে জড়িয়ে নারীবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নেতিবাচক প্রপাগান্ডার কারণে অনেকে এটা ভেবে ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করে বসে যে, ইসলাম এমন একটি নিপীড়নমূলক কাজে সায় দেয়! অথচ ইসলামের সাথে এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

এমন আরও একটি উদাহরণ হলো হিন্দু ও ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত যৌতুক প্রথা। এ প্রথায় বিয়ের সময় কনের পরিবারকে একরকম বাধ্য

(৩) ফারাওনিক খৎনা ও ইসলামে অনুমোদিত খৎনার মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। অনেকে সূচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেন। ফারাওনিক নিয়মে নারীকে যা করা হয় সেটাকে খৎনা না বলে যৌনাঙ্গহানী বলাটাই যথোচিত। পক্ষান্তরে ইসলামে এর যে প্রক্রিয়া অনুমোদিত তার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ে দেখুন http://islamqa.info/en/৪৫৫২৮— সম্পাদক।

www.pathagar.com

করা হয় পাত্রকে অনেক অর্থ-সম্পদ দিতে। এ কারণেই ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কনেদাহের মতো নির্মম প্রথার জন্ম দিয়েছে। এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ভারত সরকার যৌতুক প্রথা বন্ধের আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু তারপরও প্রতি বছর ভারতে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। এমনকি বিয়ের সময়ে প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে না পারার 'অপরাধে' অনেককে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।[৪]

ইসলামি বিধান মোতাবেক বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে মোহর প্রদান করবে। এটি দেয়া হবে স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব বহনের জন্য সে যে প্রস্তুত তার একটা প্রতীক স্বরূপ। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্র একেবারেই ভিন্ন, এখানে অধিকাংশ মুসলিমরাও স্বামীকে কনেপক্ষ থেকে যৌতুক দেয়ার কুপ্রথা দ্বারা আক্রান্ত।[৫]

---

(৪) স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা: ঢাকা শহরের শিকপাড়া এলাকার এক লোভী স্বামী যৌতুক নিয়ে বিবাদ করার এক পর্যায়ে তার তরুণী স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। পুলিশের ভাষ্য: জহির মিয়া তার স্ত্রী শাহনাজের (২০) গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে (শাহনাজ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল মৃত্যুবরণ করে। (গালফ নিউজ, ২৮-৯-৯৮, পৃষ্ঠা ১৮, ভলিউম ২০, নম্বর ১৩৯)

(৫) পারিবারিক নির্যাতন বেড়ে চলেছে পাকিস্তানে: প্রতি বছর অন্তত ৩০০ নারীকে পুড়িয়ে মারা হয় – রিপোর্ট ইসলামাবাদ (রয়টার্স)

বেসরকারি সংস্থা প্রগ্রেসিভ উইমেন'স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক নির্মিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে "পাকিস্তানে পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়টিকে মারাত্মকভাবে অবহেলা করা হচ্ছে এবং নারীদের বিরুদ্ধে এ অপরাধকে প্রতিহত করার জন্যে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।" "সংস্থাটির অনুসন্ধান মোতাবেক, 'স্ত্রী-পোড়ানো'র কারণে প্রতি বছর কমপক্ষে ৩০০ নারী হিংসাত্মক মৃত্যুর শিকার হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অপকর্মগুলির হোতা হয় ভিক্টিম-এর আপন স্বামী বা স্বামীর পরিবার", সংস্থার কর্মকর্তা শামুন হাশমীর বক্তব্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্বামীর পরিবার পুলিশের কাছে এই বলে রিপোর্ট করে থাকে যে, পুড়ে যাওয়ার ঘটনাটি নিছক একটি দুর্ঘটনা, চুলো বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছে, সুতরাং পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোনো অভিযোগ করা হয় না। এ রিপোর্ট অন্তত ১২ জন নারীর সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনির সচিত্র বিবরণ ও ছবি তুলে ধরা হয়, যাদেরকে তাদের নিকটাত্মীয়রা কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। এ মামলাগুলো যে সংস্থার মাধ্যমে চালানো হয়েছিল তারা জানে না যে, প্রায় সবগুলোতেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কোনো প্রকার শাস্তি ছাড়াই মামলার অবসান ঘটে। (গালফ নিউজ, ২৮-৮-৯৯, পৃষ্ঠা ১৮)

www.pathagar.com

দক্ষিণ মিশরে মুসলিমদের মধ্যে এমন আরেকটি কুপ্রথা প্রচলিত আছে। তাদের অনেকে মনে করে, বিধবা নারীদের জন্য পুনরায় বিয়ে করা অনুচিত। তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে এতটাই কট্টর যে, তারা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহকারী নারীকে খুন করতেও দ্বিধা করে না।[৬]

এই কুপ্রথার সূত্রপাত হলো প্রাচীন মিশরের দেবী ইসিস-এর কাহিনি থেকে। প্রাচীন মিশরের কাহিনি থেকে জানা যায়, ইসিসের ভাই সেথ তার বোন ইসিসকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাই সে ইসিসের স্বামী ওসিরিসকে[৭] হত্যা করে। কিন্তু ইসিস তার ভাই সেথকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার পুত্র হোরাস বড় না হওয়া পর্যন্ত তাকে সে লুকিয়ে রাখে। হোরাস বড় হয়ে তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তার মামা সেথকে হত্যা করে। ইসিসের প্রতি প্রবল ভক্তি থেকে এই কাহিনি প্রথমে দক্ষিণ মিশরে জনপ্রিয় হয় এবং একসময় পুরো মিশরে ছড়িয়ে পড়ে।[৮]

---

(৬) মাকে খুনের দায়ে ছেলে গ্রেফতার, কেনা, ইজিপ্ট। ২২ বছর বয়সী এক যুবক তার বিধবা মাকে জবাই করে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যখন সে জানতে পারে তার মা দক্ষিণাঞ্চলের প্রথা ভেঙে গোপনে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। গতকাল এখানকার পুলিশ এটাই বলেন। আহমাদ হাসান, তার আরেকজন আঙ্কেলের সহায়তায় সামরিয়া সালাম (৩৫) কে জোরপূর্বক নাক্কাদা গ্রামের এক কবরস্থানে নিয়ে যায়, দক্ষিণাঞ্চলের লাক্সোর রিসোর্টের উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি পল্লীগ্রাম এটি। পুলিশের ভাষ্য মতে এখানে (কবরস্থানে) আনার পর তাকে বেঁধে, হত্যা করে, শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। তারা বলেন, মহিলাটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। হাসান এবং সামরিয়ার ভাইকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করে। (গালফ নিউজ, ৩-৫-৯৮, পৃষ্ঠা ৮, ভলিউম ২০২, নম্বর ৮)

(৭) উর্বরতার দেবতা এবং মৃত রাজার মানবরূপ। এই দ্বৈত চরিত্র মিসরের দৈব রাজপদ সম্পর্কিত মতবাদের সাথে মিশে একটি নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটায়। রাজা তার মৃত্যুর সময় ওরিসিস, বা যমপুরীর দেবতায় পরিণত হয়; এবং মৃত রাজার পুত্র, জীবন্তরাজা, হরুস হিসেবে পরিচিত হয়, সে হলো আকাশের দেবতা। (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা ১০২৬)

(৮) যেহেতু সে তার পুত্রকে রক্ষা করেছিল, তাকে বলা হতো প্রতিরক্ষার দেবী, স্বামীর উদ্দেশে আহাজারি করার কারণে, সে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল আচার-অনুষ্ঠানের মূল দেবীতে পরিণত হয়; জাদুকরী হিসেবে সে অসুস্থদের আরোগ্য দিত এবং মৃতকে জীবন দান করত; মা হিসেবে সে নিজেই ছিল স্বয়ং একজন জীবন-দানকারিণী। (নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ৪০৮)

www.pathagar.com

বিধবাদেরকে পুনঃবিবাহ করতে না দেওয়ার প্রথা নীতিগতভাবেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। বরং ইসলামে তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবাদেরকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই যে, রসূল ﷺ এর প্রায় সকল স্ত্রীগণই ছিলেন বিধবা।

২. ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে গৃহীত প্রথা

অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমরা তাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে ধার করে আনা অনৈসলামিক রেওয়াজ-প্রথা চর্চায় লিপ্ত হয়েছে। যেমন, রসূল ﷺ এর জন্মদিন উদ্‌যাপন। এ প্রথার সূত্রপাত তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে, মিশরের ফাতিমী শিয়াদের হাতে। এই অনুষ্ঠান তারা শুরু করেছে খ্রিষ্টানদের ক্রিসমাসের অনুকরণ করতে গিয়ে। অনেক অঞ্চলে মিলাদ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে নাচ গান করতেও দেখা যায়। রসূল ﷺ এর মহিমা কীর্তনে এমনসব গজল সেখানে গাওয়া হয় যা সুস্পষ্ট শির্ক। এসবের অনেক গানে রসূল ﷺ এর উপর এমন অনেক গুণাবলি আরোপ করা হয়, যা কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন, মিলাদের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা হলো কসিদা আল বুরদাহ, যেটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শির্কি কথায় পূর্ণ।

এরকম আর একটি উদাহরণ হলো, কবরের উপর সৌধ বা মাজার নির্মাণ করা। এই রীতিটি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, তাজমহলের[৯] মতো অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি রকমের সীমালঙ্ঘনমূলক কাজটিও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কবরকে ঘিরে এ ধরনের বাড়াবাড়ির কারণে কিছু কবর উপাসনার স্থানে পরিণত হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে অনেক ধার্মিক ব্যক্তির কবরকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা সেসব কবরে উপাসনা করতে ছুটে যায়। মৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের আশায় তারা আরও নানা

(৯) মোঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তার স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মরণে নির্মিত, স্থান- আগ্রা, ভারত, ১৬৪৯ সাল। সম্পূর্ণ স্থাপনাটি তৈরি করতে ২০ হাজার কারিগর নিযুক্ত হয় যারা প্রতিদিন কাজ করে ২২ বছরে পুরো কাজ সম্পন্ন করে, এটি নির্মাণ করতে সর্বমোট ৪০ মিলিয়ন রুপি খরচ হয়। (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৫১৩)

www.pathagar.com

রকম শির্কি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এ ধরনের মাজারের একটি উদাহরণ হলো উত্তর ভারতের রাজস্থান প্রদেশের আজমীরে শাইখ মু'ঈন উদ্দীন চিশতীর (১২৩৬) সমাধি।[১০] ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক অজ্ঞ মুসলিমদের কাছে এটি একটি পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সারা বছর ধরেই সেখানে তার ভক্তদের আগমন ঘটে। তবে বছরের সবচেয়ে বড় উপলক্ষটি হচ্ছে তার মৃত্যুবার্ষিকী, যেটি 'উরস' নামে খ্যাত।[১১] সেখানে গিয়ে তার ভক্তরা মাজারের মধ্যে পবিত্র কামরায় প্রবেশ করে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানায় এবং কবরে চুমু খায়। এরপর সেখানে অনুগ্রহ লাভের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়; আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দোয়া করা হয়। ভক্তরা মাজারের একাংশে থাকা মার্বেল পাথরে খচিত পর্দায় সূতা বেঁধে আসেন। দু'আ কবুল হলে এবং মানত পূরণ করা হলে সে সূতাগুলো খুলে ফেলা হয়। তারা কবরের উপরে লাল গোলাপের পাঁপড়ি ছিটিয়ে আসেন। অভিজাত ব্যক্তিদেরকে সে গোলাপের পাতাগুলো তাবারুক হিসেবে রাখতে কিংবা খেতে দেওয়া হয়। তীর্থযাত্রীরা মাজারের চারপাশে তাওয়াফ করার মতো করে ঘোরেন। অনেকে আবার তার নিকট থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ বরকত কামনায় গুরুগম্ভীরভাবে চুপচাপ বসে থাকেন।[১২]

ঔপনিবেশিক আমলে খ্রিষ্টানদের অনেক ধর্মীয় রীতি মুসলিমরা পালন করতে আরম্ভ করে। যেমন বিয়ে এবং বাগদানে আংটি দেয়ার প্রথা। আজকাল অনেকে এই রীতিকে ইসলামি সংস্কৃতির অংশ মনে করে থাকে। এটা খ্রিষ্টানদের রীতি হওয়ার ব্যাপারে কারও যদি সন্দেহ থাকে তিনি প্রিন্সেস ডায়ানার বিয়েটা দেখে নিতে পারেন। তার বিয়ের অনুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রচার করা হয়েছিল। সেখানে এমন অনেক কিছু পাওয়া যাবে যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই আংটি মূলত খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের প্রতীক।

---

(১০) দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম১, পৃষ্ঠা ১৮৩।

(১১) 'উরস' শব্দটি দ্বারা বুৎপত্তিগতভাবে বিয়ে উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদকে বোঝানো হতো, নিকাহ, বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই 'উরস' বলতে বোঝানো হয় সেসব অনুষ্ঠানকে যেগুলো প্রসিদ্ধ কোনো পীরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পালিত হতো।ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৫৫।

(১২) আজমীরের মু'ইনুদ্দীন চিশতীর মঠ ও উরস, পৃষ্ঠা ১১৭-১২০।

www.pathagar.com

৩. বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়

Mysticism বা মরমিবাদ(১৩) হলো মহান স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়ার ধারণা। এ মতে, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে স্রষ্টার সাথে একীভূত হওয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করা। গ্রিক দার্শনিকদের বিভিন্ন লেখায় মরমিবাদের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন প্লেটোর সিম্পোজিয়াম। এতে বলা হয়েছে যে, মরমিবাদ হলো একটি সাধনা, যার উদাহরণ হচ্ছে অনেকটা মইয়ের মতো, যার অনেকগুলো ধাপ বেয়ে পর্যায়ক্রমে উপরে আরোহণ করতে হয়। অনেকগুলো কঠিন স্তর পেরিয়ে সর্বোচ্চে ধাপে আরোহণ করলে সেখানে মহান স্রষ্টার সাথে মিলন সম্ভব।(১৪) একই ধরনের ধারণার উপস্থিতি পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মে, সেখানে মানবাত্মার সাথে ব্রহ্মার মিলন ঘটে। এই মিলনের মাধ্যমে মানবাত্মার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মানবাত্মা মুক্তি লাভ করে।(১৫)

আধ্যাত্মিকতার নামে খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে সন্ন্যাসব্রতের চর্চা ছিল তা মুসলিমদের কাঁধে এসে ভর করে ৮ম শতাব্দীতে। কারণ এই সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা মিশর, সিরিয়াসহ খ্রিষ্টবাদকেন্দ্রিক সন্ন্যাসবাদ চর্চার মূল কেন্দ্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।(১৬) বাহ্যত ইসলাম গ্রহণের দাবিদার একদল

---

(১৩) গ্রিক 'Mystes' থেকে আগত কথাটির অর্থ 'আধ্যাত্মিকতার জগতে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে'। শব্দটি গ্রিক মরমিবাদ ধর্মমত থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার প্রবর্তকেরা 'mystes' নামে পরিচিত ছিল (ডিকশনারি অব ফিলোসফি এন্ড রিলিজিয়ন, পৃষ্ঠা ৩৭৪)।

(১৪) কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া, ভলিউম ১৭, পৃষ্ঠা ১১৪।

(১৫) ডিকশনারি অব দ্য রিলিজিওন, পৃষ্ঠা ৬৮।

(১৬) মুসলিম সুফিবাদের গবেষকগণ সুফিবাদের annihilation কে তুলনা করেছেন বৌদ্ধদের 'নির্ভানা'র সাথে। নির্ভানা বলতে স্বাধীন ও মুক্ত মনের প্রশান্ত অবস্থাকে বোঝায়। তবে অন্যদের মতে, এই তুলনাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা বৌদ্ধদের annihilation এর ধারণায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, বরং আত্মা স্থানান্তরের ধারণা আছে, যার মাধ্যমে নির্ভানার সমাপ্তি ঘটে। অপরদিকে মুসলিম সুফিবাদে, মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরের কোনো ধারণা নেই এবং এখানে এমন এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করা হয় যিনি সত্তাগতভাবে সবসময় বিরাজমান। মুসলিমদের 'ফানা' ধারণাটি বরং খ্রিষ্টানিটি থেকে এসেছে বলে প্রতিভাত হয়। This conception simply means the annihilation of the individual human will before the will of God, an idea which forms the center of all Christian mysticism. (Shorter Encyclopedia of Islam, পৃষ্ঠা ৯৮)।

www.pathagar.com

লোক ইসলামি শারী'আহ্‌র পাশাপাশি নতুন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যার নাম তারা দেয় 'তরীকা'। হিন্দুদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যেমন পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া, খ্রিষ্টানদের যেমন ঈশ্বরের সাথে একীভূত হওয়া, তেমনি মুসলিমদের মধ্যে তৈরি হওয়া নতুন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় 'ফানা' এবং 'ওসুল'। 'ফানা' মানে হলো মনের যাবতীয় অহংবোধের অবসান এবং 'ওসুল' বলতে বোঝায় এই জীবনে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা এবং তাঁর সাথে মিলে এক সত্তায় পরিণত হওয়া। প্রাথমিক অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে এ অবস্থায় উন্নীত হতে হয়। এ ধাপ এবং পর্যায়গুলোকে তাদের পরিভাষায় বলা হয় 'মাকামাত' (স্টেশন) এবং 'হালাত' (অবস্থা)। নানা রকম আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা হয় এই 'দর্শন' লাভের জন্য। এ অনুশীলনের একটি হলো বিশেষ প্রক্রিয়ার যিক্‌র।[১৭] এই যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে সুরের তালে ভুল-শুদ্ধ নানা রকম বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথে শরীর দোলানো; একা কিংবা দল বেঁধে নাচানাচি, গান-বাজনা, ঢোল-বাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড। তারা বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রের বরাত দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, এই ধরনের চর্চা রসূল ﷺ শিখিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের কোনোটিতেই এমন কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ধারার হাত ধরে খ্রিষ্টানদের মতো মুসলিমদের মাঝেও হরেক রকম 'তরীকা' ও 'ফিরকা'র উদ্ভব ঘটে। দলগুলোর নামকরণ করা হয় তার প্রতিষ্ঠাতার নামের সাথে মিল রেখে। যেমন 'সাবেরিয়া', 'কাদেরিয়া', 'চিশতিয়া', 'নকশাবন্দি', 'তিজানী' ইত্যাদি। এই দলগুলোর প্রতিষ্ঠাতা এবং এদের সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রচিত হয় অজস্র কেচ্ছাকাহিনি, লোককথা এবং উপাখ্যান। হিন্দু এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা যেমন করে লোকালয় থেকে দূরে আশ্রম বা মঠ স্থাপন করে সেখানে তাদের ভক্তদের আশ্রয় দিয়ে থাকে; এরাও একইভাবে 'খানকা', 'দরগাহ', 'মাজার' ও 'দরবার' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। 'আল্লাহর সাথে একীভূত' হওয়ার এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে অনেক রকম ভ্রান্ত 'আকীদাহ। এদের অধিকাংশ ফিরকা দাবি করে যে, 'ওসুল' এর পর্যায়ে

(১৭) যিক্‌র, যার সাধারণ অর্থ আল্লাহর স্মরণ। সুফিদের আসরগুলোতে এটি দিয়ে বুঝানো হয় একটানা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি জপ করতে থাকা।

www.pathagar.com

উপনীত হতে পারলে আল্লাহর দর্শন লাভ করা যায়। কিন্তু আমরা জানি, যখন 'আইশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মিরাজে তিনি আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন কি না, তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, তিনি আল্লাহ ﷻকে স্বচক্ষে দেখেননি।[১৮] তেমনিভাবে মূসা ﷺ এর বেলায়ও এমনটিই হয়েছিল। মূলত কোনো মানুষের পক্ষেই এই জীবনে আল্লাহর দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। কীভাবে মানুষের পক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করা সম্ভব যেখানে একটি পাহাড়ের উপর তিনি নূর বিকিরণ করায় সেটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[১৯]

সুফিদের অনেকে দাবি করে যে, কেউ যদি ওসুল এর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে তখন তার জন্য আর শারী'আহ্‌র বিধি-নিষেধ: যেমন সলাহ, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, পর্দা ইত্যাদি পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ কিংবা পীর-বুজুর্গদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এসব পীর-ফকিরদের মাজার ও কবরকে ঘিরে তাওয়াফ,[২০] তাদের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গসহ নানা রকম 'ইবাদাতের প্রচলন শুরু হয়। ভারতে খাজা মু'ঈনুদ্দিন চিশতী, মিশরে যায়নাব এবং সাইয়িদ আল বাদাউয়ি, সুদানে মুহাম্মাহ আহমাদ এবং ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন দরবেশদের দরগাহগুলোতে এসব নিষিদ্ধ কাজ সবসময়ই করা হয়।

সুফিদের এই ধরনের আসরে গান-বাজনা, গাঁজা, ভাং, মারিজুয়ানাসহ নানা রকম মাদকদ্রব্য সেবন করা হয়। লোকদের মধ্যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলার জন্যই এসব করা হয়। সুফিদের এসব যাবতীয় খারাপ কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর সাথে মানুষের মিলিত হওয়ার ভ্রান্ত 'আকীদাহ। আবদুল কাদির জিলানিসহ পূর্বসূরী যেসব ব্যক্তিবর্গের নামে বিভিন্ন সুফি তরীকার প্রচারণা চালানো হয় তা মোটেই সত্যি নয়। কেননা তারা বিশ্বাস করতেন যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনোই এক হতে পারে না; কারণ একটি চিরস্থায়ী এবং ঐশ্বরিক, অপরটি মানবীয় এবং সীমাবদ্ধ;

---

(১৮) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ১১১-১১২, নম্বর ৩৩৭, ৩৩৯ এবং পৃষ্ঠা ১১৩, নম্বর ৩৪১।

(১৯) সূরাহ আল-'আরাফ ৭:১৪৩।

(২০) ধর্মীয় উপাসনার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে এর চারদিকে ঘোরা।

www.pathagar.com

তারা কখনোই স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টির বিলীন হয়ে যাওয়া কিংবা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির একাকার হয়ে যাওয়াকে সমর্থন করেননি।

সুফিবাদ থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে তা সম্ভবত আল্লাহ ﷻ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজনীয়তার ধারণা। এর ফলে আল্লাহর সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার দাবিদার ব্যক্তিদেরকে বিশেষ স্তরে উন্নীত করা হয়। অনেক সময় সরাসরি তাদের কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়; অন্ততপক্ষে তাদেরকে আল্লাহর কাছে আবেদন-নিবেদন করার মধ্যস্থতাকারী বিবেচনা করা হয়।

৪. ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং দলাদলি

মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামি আইনশাস্ত্রের চারটি স্বীকৃত ধারা বা মাযহাব আছে।[২১] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাযহাব অনুসরণের নামে অনেক সময় মুসলিমরা নিজেদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সামাজিক রেওয়াজ প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তির যে সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তার বাস্তবতা বুঝতে হলে প্রথমে 'ইসলামি আইন' পরিভাষাটির প্রায়োগিক অর্থ জানতে হবে। ফিক্‌হ এবং শারী'আহ্- এ দুটো আরবি শব্দকে অসতর্কভাবে অনেক সময় 'ইসলামি আইন' অনুবাদ করা হয়। অথচ আরবিতে এ দুটো শব্দ মোটেই সমার্থবোধক নয়। কোনো মুসলিম 'আলিমও এ দুটো শব্দকে একই অর্থবোধক মনে করেন না।

'শারী'আহ্' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো এমন জলাধার যেখান থেকে পশুপাখিরা পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। কুর'আনে 'শারী'আহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'সরল পথ' অর্থে। ইসলামি পরিভাষায় নাবি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ বিধি-বিধানের সমষ্টিকে শারী'আহ্ বলা হয়; যা কুর'আন ও রসূল ﷺ এর সুন্নাহ্‌র মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। আর 'ফিক্‌হ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, কোনো কিছুর সত্যিকার অর্থ বা তাৎপর্যকে

(২১) মাযহাবগুলোর নাম হলো হানাফি, শাফে'ই, মালিকি এবং হান্‌বালি।

www.pathagar.com

সঠিকভাবে অনুধাবন করা। রসূল ﷺ এর একটি হাদীস্ এই অর্থের যথার্থতা স্পষ্ট হয়:

"আল্লাহ ﷻ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দীনের ফিক্হ দান করেন।"[২২]

ইসলামি পরিভাষায় 'ফিক্হ' বলতে এমন একটি বিজ্ঞান বা শাস্ত্রকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে যেকোনো সমস্যার সমাধান বের করা হয়। ফিক্হশাস্ত্রের প্রধানতম উপাদান হলো ইজতিহাদ, যা ইজমা' এবং কিয়াসের সাহায্যে কাজ করে। ব্যাপক অর্থে, ফিক্হ বলতে ইসলামি শারী'আহ্ থেকে উৎসারিত সকল আইনের সমষ্টিকে বোঝায়।

পার্থক্য: উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞা থেকে শারী'আহ্ এবং ফিক্হ এর মধ্যে চারটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:

১. শারী'আহ্ হলো সরাসরি কুর'আন-সুন্নাহতে প্রাপ্ত সাধারণ বিধি-বিধান। আর ফিক্হ হলো নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানে শারী'আহ্র আলোকে প্রণীত বিধান যা সেখানে সরাসরি পাওয়া যায় না। এ বিধানগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়।

২. শারী'আহ্ স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল, আর ফিক্হ পরিস্থিতিভেদে পরিবর্তন হতে পারে।

৩. শারী'আহ্র হুকুমগুলো সাধারণত সার্বজনীন, এগুলো আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা রচনা করে দেয়। অপরদিকে, ফিক্হ হয় সুনির্দিষ্ট; কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে শারী'আহ্র বিধানের প্রয়োগ ঠিক কীভাবে করা হবে সেটা নির্ধারণ করা হয় ফিক্হশাস্ত্রের মাধ্যমে।[২৩]

৪. শারী'আহ্ ব্যাপকার্থক, যাতে 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদাত ও মু'আমালাহ্র সমাহার থাকে, পক্ষান্তরে ফিক্হ শুধু ব্যবহারিক বিধিমালার সমষ্টি।

---

(২২) সহীহ্ আল-বুখারি, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪, নম্বর ৩৩৭ এবং সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ১০৬১, নম্বর ৪৭২০।

(২৩) Evolution of Fiqh, পৃষ্ঠা ১-২।

www.pathagar.com

শারী'আহ্ এবং ফিক্‌হের এ পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে যে, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল যুগ ও স্থানের জন্য ইসলাম একটি শাশ্বত, কল্যাণকর ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা। অনেক মানুষই জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু বুঝতে পারে না যে, ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত আইন-কানুন দ্বারা আজকের দিনেও মানবসমাজ পরিচালিত হতে পারে। মূলত এ সমস্যাটি তাদেরই হয় যারা ইসলামি আইনকে মধ্যযুগের ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক আইন-ব্যবস্থার মতো মনে করে।

ইসলামি বিধি-বিধান একইসাথে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ কীভাবে হবে, তার সাথে স্রষ্টার, মানুষের এবং গোটা পৃথিবীর সকলের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। আর বাস্তবেও এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষের মৌলিক প্রকৃতিতে কখনোই কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না। প্রযুক্তিগত উন্নতিও মানুষকে নৈতিক কোনো উন্নতি দেয়নি। বরং, বর্তমান এই আধুনিক সমাজ পূর্বের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নীতিবিবর্জিত। তাছাড়া এটাও ভুল যে, আধুনিক প্রযুক্তি অতীতের সকল প্রযুক্তিবিদ্যাকে হার মানিয়ে দিয়েছে। কেননা, প্রাচীন প্রযুক্তির এমন অনেক নিদর্শন এখনো দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো উৎকর্ষের বিবেচনায় বর্তমান যুগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন মিশরীয়দের মমিকরণ বিদ্যা এবং তাদের পিরামিড স্থাপত্য; কিংবা সেন্ট্রাল অ্যামেরিকার প্রাচীন মায়ান সভ্যতায় তখনকার সময়ের সাদাসিধে কৌশল ব্যবহার করে ধাতু ঘষে আয়নায় পরিণত করার প্রযুক্তি অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেহেতু মৌলিকভাবে মানুষের প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় কেবল তার বাঁচার উপায়-উপকরণের; কাজেই ১৪০০ বছর আগের বিধান মানুষের জন্য তখন যেমন উপযোগী ছিল, আজও একইভাবে উপযোগী। সাথে রয়েছে ইসলামি আইনের ফিক্‌হ্ শাস্ত্র; যা যেকোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সে বিধানের প্রয়োগ-উপযোগিতাকে সহজ করে তোলে।

www.pathagar.com

ইসলামি আইনশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ইসলামি আইন বা ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে সকল মাযহাবেরই কম বেশি অবদান রয়েছে। এককভাবে কোনো একটি মাযহাবই গোটা দীন ইসলামের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না। ইসলামিক শারী'আহ্‌র ব্যাখ্যা ও এর প্রয়োগে প্রতিটি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর যাঁর মাযহাব সকল ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে, যাঁর মাযহাব শর্তহীনভাবে সকলের মেনে চলা উচিত, তিনি হলেন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ ﷺ। শারী'আহ্‌র যেকোনো ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যাকেই আল্লাহর নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া অন্য সকল মাযহাবই হলো মানবীয় প্রচেষ্টার ফসল, তাই সেগুলোর কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ইমাম শাফি'ই (রহ.) খুব চমৎকারভাবে বিষয়টি এভাবে বলেছেন যে, "আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে আল্লাহর রসূলের সকল কথা কাজ প্রত্যক্ষ করেছে কিংবা তার কোনো কিছুই ভুলে যায়নি। কাজেই, আমি যে মাস'আলাই তোমাদের মেনে চলতে বলি, কিংবা যে উসুলই আমি প্রতিষ্ঠা করি, তার মধ্যে এমন কিছু থাকতেই পারে যা আল্লাহর রসূলের সুন্নাহর বিপরীত। চূড়ান্ত সঠিক হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আর সত্যিকার অর্থে সেটাই হলো আমার নিজের মাযহাব।"[২৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে, ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হিসেবে ইজমা' বিকাশ লাভ করে এবং কিয়াস শিরোনামের অধীনে ইজতিহাদ একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই সময়ে মাযহাব ছিল একটিই, আর তা হলো রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফাহর মাযহাব। কারণ যেকোনো আইনি বিষয়ে সকল বিজ্ঞ সহাবিদেরকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও, সকলের মতামত শুনে খলিফাই সিদ্ধান্ত দিতেন, আর তার মতকেই চূড়ান্ত মত হিসেবে গ্রহণ করা হতো। তবে তারা তাদের কোনো সিদ্ধান্তকেই আল্লাহর রসূলের সুন্নাহর উপরে স্থান দিতেন না। তাদের সকল সিদ্ধান্তকেই তারা পরিবর্তনযোগ্য মনে করতেন। কোনো ব্যাপারে তারা যদি জানতে পারতেন যে, তাদের সিদ্ধান্ত

(২৪) আল-হাকিম ইব্‌ন 'আসাকির কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ দিমিশক, ভলিউম ১৫, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৩।

www.pathagar.com

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের খেলাপ হয়েছে, সাথে সাথে তারা তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুন্নাহকে গ্রহণ করে নিতেন।

উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফত শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্রে রূপ নেয়। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের মতকে আর শার'ই ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হতো না। 'আলিম সাহাবিগণ এবং তাদের ছাত্ররা ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছেড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকলেন। এর ফলে ইজতিহাদের পরিসর ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকলো এবং ইজমা গঠন করা একরকম প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এ পর্যায়ে এসে ফিক্‌হশাস্ত্রের অধ্যয়ন একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ছাত্ররা স্বাধীনভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন আইনি বিষয়ে মতবিনিময় আরম্ভ করেন। এ কারণে 'আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-৮৫০) অনেকগুলো মাযহাবের জন্ম হয় এবং তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে পরিচিতি লাভ করে। তবে আইনি সিদ্ধান্ত প্রদান কিংবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব মাযহাবের বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যেও পূর্ববর্তীদের মতো উদারতা, বিনয় ও পরমতসহিষ্ণুতা বিদ্যমান ছিল। ব্যাপকভাবে স্বীকৃত চারটি মাযহাব ছাড়াও তৎকালীন সময়ে আরও বেশ কয়েকটি পরিচিত মাযহাব ছিল। যেমন, আওযা'ই, লাইসি, সাওরি, যাহিরি এবং জারীরি মাযহাব।

মাযহাবের প্রথম সারির 'উলামায়ে কেরামগণের মৃত্যুর পর মাযহাব অনুসরণ নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়। 'আব্বাসীয় শাসনামলের শেষদিকে এসে, ৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন মাযহাবের 'আলিমদের মধ্যে মুনাযারা, বাহাস বা বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রচলন শুরু হয়। খলীফাহ ও তার সহচরদের মধ্যে এটা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এটাকে তারা একটা বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করেন। এর ফলে বিভিন্ন মাযহাবের 'আলিমদের মধ্যে পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এক সময়ে এসে তা এক প্রকার গোঁড়ামিতে রূপ নেয়। কারণ এসব বিতর্কে পরাজিত হলে খলীফাহর কাছ থেকে শুধু অর্থকড়ি পাওয়ার সুযোগই নষ্ট হতো তা নয়, বিতর্কে জয়ী হওয়া তাদের এবং তাদের মাযহাবের মানসম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক নিজ মাযহাবের সঠিকতা

www.pathagar.com

প্রমাণের জন্য শক্ত অবস্থান নেওয়ার ব্যাপারটিকে খুবই প্রশংসার চোখে দেখা হতো। এর পরিণতিতে মাযহাবগুলোর মধ্যে দলাদলি শুরু হয় এবং 'আলিমদের মধ্যে গোঁড়ামি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে এই ধরনের বিতর্কের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এবং মাযহাবগুলোর মধ্যকার দলাদলি চরম আকার ধারণ করে।[২৫]

চার মাযহাব

এই পর্যায়ে এসে প্রধান মাযহাবের সংখ্যা চার-এ এসে দাঁড়ায়; এর মাঝে তিনটি বড়, একটি একটু ছোট। আওযা'ই, সুফিয়ান আস সাওরী, ইব্ন আবি লায়লা, আবু সাওর, লাইস ইব্ন সা'দ প্রমুখ ইমামদের মাযহাবসমূহের বিলুপ্তি ঘটে। কেবল ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফি'ই এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহ) এই চারজনের মাযহাব টিকে থাকে। এই চারটি মাযহাব এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, সাধারণ মানুষ অন্য মাযহাবগুলোকে এক পর্যায়ে ভুলেই যায়। তাছাড়া, এই চারটি মাযহাবের লোকেরা নিজ মাযহাবকে জনপ্রিয় করতে নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে। অনেকে নিজেদের নামের সাথে মাযহাবের নাম যুক্ত করার রেওয়াজ চালু করে। যেমন, আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগাওয়ি, যিনি ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শারহুস সুন্নাহ'র লেখক, তিনি নিজ নামের শেষে মাযহাব অনুসরণে আশ-শাফি'ই উপাধি যুক্ত করে দেন।

তাক্‌লীদের[২৬] উদ্ভব

সর্বশেষ 'আব্বাসীয় খলীফাহ মু'তাসিমকে হত্যা এবং ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর থেকে শুরু করে খ্রিষ্টীয় ১৯ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ এই ছয় শতাব্দীকে বলা যেতে পারে 'মুসলিমদের অন্ধকার যুগ'। ১২৯৯ সালে

(২৫) আল-মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫৭।

(২৬) অন্ধ অনুসরণ।

www.pathagar.com

তুর্কী নেতা প্রথম 'উস্‌মানের হাতে 'উস্‌মানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে এর পতন দ্বারা এ সময়টাকে চিহ্নিত করা হয়।

এই সময়ের 'আলিমগণ নিজেরাও ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ বর্জন করেন এবং ইজতিহাদের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আইন জারি করেন। তাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে তারা যুক্তি দেখান যে, সম্ভাব্য ঘটমান সকল বিষয়ের আলোচনা করে তার সমাধান দেওয়া হয়ে গেছে; কাজেই নতুন করে আর কোনো ইজতিহাদ করার প্রয়োজন নেই।[২৭]

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর মাযহাবের ব্যাপারে এমন নতুন একটি ধারণা জন্ম লাভ করল যে, চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসারী না হলে তার ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। সময়ের সাথে সাথে এই ধারণাটি 'আলিমদের সাথে সাধারণ মানুষের মনেও গেঁড়ে বসে। ফলে দীন ইসলাম হানাফি, মালিকি, শাফি'ই এবং হাম্বলি—এই চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, এই চারটি মাযহাবকে প্রায় ওয়াহ্‌য়ির সমান মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়। দাবি করা হয়, এই চারটি মাযহাবের সবকিছুই একেবারে সঠিক। এগুলোর প্রত্যেকটির মর্যাদা সমান এবং সকল মতপার্থক্য সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে এর প্রতিটি মাযহাব নির্ভুল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে।

মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু 'আলিম কিছু কিছু হাদীসের এমন ব্যাখ্যাও দাঁড় করান, যাতে মনে হতে থাকে যে, রসূল ﷺ নিজেই এই চার ইমাম এবং তাদের মাযহাবের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। এর ফলে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, এই স্বীকৃত মাযহাবসমূহের বাইরে পা রাখাকে গোমরাহি মনে করা হতো। এমনকি যদি কেউ এই মাযহাবগুলোর কোনো একটিকে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হতো। অতিসংরক্ষণশীল অনেক 'আলিম নিয়ম জারি করেন যে, কেউ যদি এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব পালন করা শুরু করে, তাহলে স্থানীয় বিচারক তাকে শাস্তি দিতে পারবেন। হানাফি

(২৭) মুহাম্মদ হুসেইন আয-যাহাবী, আশ-শারী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ, (মিশর: দারুল কুতুব আল-হাদীস্, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৮), পৃষ্ঠা ১২।

www.pathagar.com

মাযহাবের লোকদের জন্য শাফি'ই মাযহাবের কারো সাথে বিয়ে-শাদি পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[২৮] এমনকি ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সলাহ পর্যন্ত এদের গোঁড়ামি থেকে রক্ষা পায়নি। এক মাযহাবের অনুসারীরা আরেক মাযহাবের ইমামের পেছনে সলাহ আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে যেসব এলাকায় বিভিন্ন মাযহাবের লোক বসবাস করত সেখানে একই মসজিদে[২৯] ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের জন্য সলাহ আদায়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্ধারণ করা হয়। মুসলিমদের দীন ইসলাম ও ঐক্যের প্রতীক মক্কার পবিত্র মাসজিদুল হারামকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। কা'বা ঘরের চারপাশে সলাহ আদায়ের জন্য প্রত্যেক মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ইমাম নির্ধারণ করা হয়। সলাহর সময় হলে প্রত্যেক মাযহাবের ইমাম এসে নিজ মাযহাবের অনুসারীদের ইমামতি করতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্ভাগ পর্যন্ত এই রীতি চালু ছিল। ১৯২৪ সালে 'আবদুল 'আজীজ ইব্ন সা'উদের মাক্কা বিজয়ের পরই তা পরিত্যাগ করা হয় এবং সকল মুসলিমরা পুনরায় একজন ইমামের নেতৃত্বে সলাহ আদায় শুরু করেন।

এই সময়ে উসূলুল ফিক্‌হ বা ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতির উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থসমূহে ইজতিহাদ করার সঠিক পদ্ধতির রূপরেখা তুলে ধরা হয় এবং এর শর্তগুলোকে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এসব গ্রন্থে তাদের আরোপিত শর্তগুলো এতটাই কঠোর ছিল যে, একে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হলে ইজতিহাদের যোগ্যতার আওতা থেকে শুধু তদানীন্তন 'আলিমরাই নন; বরং মুজতাহিদ সালাফ আস-সালেহীন 'আলিমগণও বাদ পড়ে যান। এ যুগে 'ফিকহে মুকারান' বা বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা নিয়ে কিছু গ্রন্থ রচনা হয়। এসব গ্রন্থে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত এবং তার দলিল-প্রমাণসমূহ জোগাড় করে ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়। তবে বইগুলোর লেখকগণ অতঃপর নিজের অনুসৃত মাযহাবের মতকেই সবচেয়ে সঠিক এবং নির্ভুল হিসেবে প্রমাণে সচেষ্ট হন।

---

(২৮) মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল-আলবানি, সিফাত সলাহ আন-নাবি, (বৈরুত: আল-মাক্‌তাব আল-ইসলামি নবম সংস্করণ ১৯৭২), পৃষ্ঠা ৫১।

(২৯) মাসজিদ (বহুবচন - মাসাজিদ), মুসলিমদের 'ইবাদাতের স্থান।

www.pathagar.com

এই সময়ের শেষ দিকে এসে 'উসমানি খলীফাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি আইনসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গ্রন্থ আকারে সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম সারির সাতজন 'আলিমের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেলের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৮৭৬ সালে এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং সুলতান 'উসমানি সাম্রাজ্যজুড়ে 'মাজাল্লাহ আল-আহকাম আল-'আদিলাহ' শিরোনামে এই আইন জারি করা হয়[৩০]। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে চমৎকার এই উদ্যোগটিও মাযহাবি পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়। এই কমিটির সকল 'আলিমগণই ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। যার কারণে এই আইনগ্রন্থটিতে ফিকহশাস্ত্রের অন্যান্য মাযহাবসমূহকে প্রায় একেবারেই উপেক্ষা করা হয়।

কলম্বাস (১৪৯২) এবং পনের শতকে ভাস্কো ডি গামার সমুদ্র অভিযাত্রার মাধ্যমে সূচনা হয় পশ্চিমা ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রুট এবং কেন্দ্র দখলের কার্যক্রম। পরবর্তীতে পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে একে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তগত হতে থাকে, যার সূচনা হয় ১৬৮৪ সালে ডাচদের হাতে জাভা দ্বীপপুঞ্জ পতনের মধ্য দিয়ে। 'উসমানিয়দের হাত থেকে যখন ট্রানসিলভানিয়া এবং হাংগেরী অস্ট্রিয়ার হাতে চলে যায় এবং রাশিয়ানদের হাতে ১৭৬৮-৭৪ এর রুশো-তুর্কী যুদ্ধে 'উসমানিয়দের পরাজয় ঘটে, তখন থেকে ইউরোপিয়ান অঞ্চলসমূহ থেকে 'উসমানিয়দের কর্তৃত্ব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।[৩১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'উসমানি সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটার আগ পর্যন্ত পরাজয় অব্যাহত থাকে এবং 'উসমানি খিলাফতের বিভিন্ন অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনি এবং আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বের আইনব্যবস্থা ইউরোপিয়ান আইনব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে আসন গেঁড়ে বসে।

যদিও কাগজে-কলমে বেশ আগেই ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে, কিন্তু মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আইনব্যবস্থা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি,

(৩০) আনোয়ার আহমাদ কদরি, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, (লাহোর, পাকিস্তান: আশরাফ, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩) পৃষ্ঠা ৬৫।

(৩১) ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ৮৫।

www.pathagar.com

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। সৌদি আরবে যে ইসলামি আইন প্রচলিত আছে তা হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, পাকিস্তানে তা করা হয়েছে মূলত হানাফি মাযহাব অনুসারে এবং ইরানে সাম্প্রতিককালে জা'ফরি মাযহাবের উপর ভিত্তি করে।[৩২]

সংস্কারকগণ

মুসলিম জাতির মাঝে মারাত্মক অধঃপতন সত্ত্বেও যুগে যুগে এমন অনেক ন্যায়নিষ্ঠ 'আলিমের আবির্ভাব ঘটে যারা অন্ধ অনুসরণের বিরোধিতা করেন এবং ইজতিহাদের ধারা সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেন। তারা মানুষকে দীন ইসলামের মূল উৎস কুর'আন এবং সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার প্রতি আহ্বান জানান। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ইমাম আহমাদ ইব্ন তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ (১২৬৩-১৩২৮)। তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক রেওয়াজ-প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করার কারণে তার সমসাময়িক কেউ কেউ তাকে মুরতাদও ঘোষণা করে এবং শাসনকর্তৃপক্ষ তাকে অনেকবার কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে সেরা 'আলিম। প্রাথমিক জীবনে তিনি হাম্বলি ফিক্‌হ নিয়ে পড়াশোনা করলেও নিজে তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি ইসলামি শারী'আহ্‌র উৎস নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন এবং ইসলামি জ্ঞানের যত শাখা তখন প্রচলিত ছিল তার সবকটিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার ছাত্ররাও ছিলেন তাদের সময়ের সবচেয়ে বড় 'আলিম এবং তারাও পরবর্তী প্রজন্মে ইজতিহাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন এবং তাদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের উস্তাদদের ধারা অব্যাহত রাখেন। তাদের মাঝে বিখ্যাত ছিলেন ইমাম ইব্নুল কায়্যিম (১২৯২-১৩৫০), যিনি ছিলেন ফিক্‌হ এবং হাদীস্‌শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ; ছিলেন ইমাম আয যাহাবি (১২৭৪-১৩৪৮), যিনি ছিলেন বিখ্যাত হাদীস্‌ বিশারদ এবং আরও রয়েছেন ইমাম ইব্ন কাসীর (১৩০২-১৩৭৩), যিনি একাধারে একজন তাফসীরবিদ, একজন ইতিহাসবেত্তা এবং একজন হাদীস্‌ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত।

---

(৩২) ইস্‌না 'আশরিয়াহ এর ফিক্‌হি মাযহাব, শিয়া অনুসারীরা একে মিথ্যাভাবে ইমাম জাফর আস-সা'দিকের মাযহাব হিসেবে আরোপ করে থাকে (৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)

www.pathagar.com

এমন উল্লেখযোগ্য আর একজন সংস্কারক ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম আহমদ ইব্ন 'আবদুর-রহীম, যিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) নামে অধিক পরিচিত। তার জন্ম ভারতীয় উপমহাদেশে, যেখানে তাকলীদের প্রচলন সম্ভবত সবচেয়ে ব্যাপক। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং হানাফি ফিক্‌হের উপর দক্ষতা অর্জনের পর তিনি ইজতিহাদের ধারাকে পুনরায় চালু করা এবং বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানান। ইসলামি আইনশাস্ত্র এবং বিভিন্ন মাযহাবে আইন প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ পুনঃনিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ হাদীস্‌শাস্ত্রের অধ্যয়নের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেন। তবে তিনি ফিক্‌হ এর কোনো মাযহাবকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেননি। তিনি সকলকে এই শিক্ষা দেন যে, কোনো বিষয়ে কারো কাছে তার নিজ মাযহাবের মতের চেয়ে অন্য মাযহাবের মতকে কুর'আন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে হলে তিনি তা গ্রহণ করার স্বাধীনতা রাখেন।[৩৩]

এই সময়কার আরও একজন সংস্কারক হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলি আশ-শাওকানি (১৭৫৭-১৮৩৫ সাল)। তার জন্ম ইয়েমেনের শহর শাওকানের নিকটে। প্রথম জীবনে তিনি জায়েদি মাযহাবের[৩৪] ফিক্‌হ-এর উপরে অধ্যয়ন করেন, এবং এই মাযহাবের একজন 'আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এরপরে তিনি হাদীস্‌শাস্ত্রের উপর গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন এবং একটা পর্যায়ে তিনি হাদীস্‌শাস্ত্রে তার যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত 'আলিমে পরিণত হন। এ পর্যায়ে এসে তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ শুরু করেন। ফিক্‌হের এবং ফিক্‌হের মূলনীতির উপরে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন মাস'আলাকে সকল মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার পর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সেসব বিষয়ে সমাধানে উপনীত হন। ইমাম আশ-শাওকানি অন্ধ অনুসরণকে হারাম মনে করতেন এবং এ বিষয়ে একাধিক বই রচনা করেন। সংস্কারধর্মী

(৩৩) এ.জে. আরবেরী, মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৯- পুনঃপ্রকাশ ১৯৮১) ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

(৩৪) শিয়া ফিক্‌হি মাযহাবগুলির মাঝে একটি অন্যতম মুখ্য মাযহাব (দেখুন পৃষ্ঠা ৬০-৬৫)।

www.pathagar.com

এসব ভুমিকার কারণে অবশ্য তিনি তার সমকালীন বেশিরভাগ 'আলিমেরই সমালোচনার শিকার হন।[৩৫]

ইসলামি পুনর্জাগরণ

উনিশ শতকে এসে মুসলিম চিন্তাবিদরা ঐতিহ্যের বেড়াজালে আটকে পড়া এই 'প্রথাগত ইসলাম' এর বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের এ পুনর্জাগরণ দুটি বিপরীতধর্মী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে modernism বা আধুনিকতাবাদ এবং অপরটি হলো fundamentalism বা মৌলবাদ।

মডার্নিজমের প্রবর্তকরা ছিলেন মূলত পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিত মুসলিম। এই ধারাটি তাদের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিকতাবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ইসলামি জীবনধারাকে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। অপরদিকে মাযহাবের গোঁড়ামির বিপক্ষে যারা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র মূল ধারার দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করেছিলেন, তাদের ধারাকে নাম দেওয়া হয়েছে মৌলবাদ বা fundamentalism; মূলত এই ধারার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের জীবন পরিচালনার জন্য বিশুদ্ধভাবে কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা।

আধুনিকতাবাদ বা Modernism

এই ধারার বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে অগ্রণী ছিলেন জামাল আদ-দীন আল-আফগানি (১৮৩৮-১৮৯৭), যিনি প্রায় গোটা মুসলিম বিশ্বে ঘুরে ঘুরে সংস্কার ও প্যান-ইসলামিজম এর ডাক ছড়িয়ে দেন। জামাল আদ-দীন ভারত, মাক্কা এবং ইস্তাম্বুলে ভ্রমণ করেছেন এবং সবশেষে তিনি স্থায়ী হন মিশরে। তিনি মুক্ত রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিকে মানুষকে আহ্বান করেন এবং তাক্‌লীদ ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার

(৩৫) মুহাম্মদ বিন 'আলি আশ-শাওকানি, নাইল আল-আওতার, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ৩-৬।

www.pathagar.com

হন। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে[৩৬] তিনি তার মতবাদ প্রচার করেন এবং অনেকেই তার এ আদর্শে উজ্জীবিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু ব্যাপারে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যেমন, তিনি মানুষের মন এবং মানবীয় যুক্তিবোধ হতে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ওয়াহ্‌য়ির সমপর্যায়ে স্থান দিয়ে ফেলেন। তার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করে, যখন শোনা যায় তিনি ম্যাসনিক মুভমেন্টের সাথে জড়িত এবং মধ্যপ্রাচ্যে সে আন্দোলনের শাখা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করছেন।[৩৭]

মুহাম্মদ 'আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫) ছিলেন আফগানির সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র। আফগানি এবং ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহর মিলিত প্রভাবে মুহাম্মদ 'আব্দুহুর হাতে ইজতিহাদের ধারা আবার চালু হয় এবং তাক্‌লীদ ও তাক্‌লীদের সমর্থকদেরকে সুকৌশলে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়। আফগানি পুনর্জাগরণের জন্য যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তা হলো প্রত্যেকটি দেশের মুসলিমদেরকে অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করে যেতে হবে, যা হবে একটি সাধারণ প্যান-ইসলামিক মুভমেন্টের অংশ, যেখানে প্রত্যেকটি জাতি একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। এ লক্ষ্যে মুহাম্মাদ 'আব্দুহু মিশরে তার ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। তিনি নৈতিক উন্নতি, আলোকিত শিক্ষা এবং সতর্কতার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের নতুন নতুন ব্যাখ্যার উপর জোর দেন। কিন্তু আফগানি যে সকল ভ্রান্ত ও চরমপন্থী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তা মুহাম্মাদ 'আব্দুহুকেও কিছুটা প্রভাবিত করে; যার কারণে তিনি অতিআধুনিকতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ফিক্‌হি বিষয়ে তার বেশ কিছু বিচ্যুতি ঘটে। তাই তার তাফসীরে এক ধরনের পরাজিত মানসিকতার কৈফিয়তমূলক ভাষা খুব সহজেই চোখে পড়ে। নাবিদের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় সরাসরি ঘটা মু'জিযাগুলোর ভৌত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। যেমন তার মতে, আবরাহার হস্তিবাহিনীর

(৩৬) মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি সর্বপ্রথম ফাতিমিদ শিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক মিসরে স্থাপিত হয় ৩৬১ হিজ্‌রি সনে/ ৯৭২ খিস্টাব্দে।

(৩৭) মুহাম্মদ হুসেইন, আল-ইত্তিজাহাত আল-ওয়ানিয়াহ ফি আল-আদাব আল-'আরাবি আল-মু'আসির, ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ১৫২, আরও দেখুন রিলিজিয়ন ইন দ্য মিডল ইস্ট, ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৩৭।

www.pathagar.com

উপর যে পাখিগুলো পাথর নিক্ষেপ করেছিল সেগুলো কোনো পাখি নয়, বরং ছিল বায়ুবাহী জীবাণু যা তাদের মাঝে রোগ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এছাড়াও, তিনি সুদী কারবারের বৈধতা দিয়ে একটি ফতোয়া ইস্যু করেছিলেন। চরম প্রয়োজনের সময় হারাম জিনিস গ্রহণের অনুমতি প্রসঙ্গের ফিক্‌হি মূলনীতির ভুল প্রয়োগ করে তিনি এ সিদ্ধান্ত দেন। অথচ এটা সকলেরই জানা যে, এক্ষেত্রে চরম প্রয়োজন বলতে ফিকহে যা বোঝানো হয় তা হলো জীবন-মৃত্যু, অঙ্গহানি বা এ ধরনের মারাত্মক কিছু। নিছক ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতি কিছুতেই এ বিধানের আওতায় পড়বে না। মুহাম্মাদ 'আব্দুহুর প্রধানতম ছাত্র, মুহাম্মাদ রাশীদ রেযা (১৯৩৫), তার শিক্ষকের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তাকলীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন, তবে তিনি তার শিক্ষকের অধিকাংশ বাড়াবাড়িগুলো গ্রহণ করেননি। তারপরও মুহাম্মদ 'আব্দুহু'র অন্যান্য ছাত্ররাই এই অতি আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের শিক্ষককেও ছাড়িয়ে যান। যেমন, মুহাম্মদ 'আব্দুহু'র ছাত্র কাসিম আমীন (১৯০৮) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইসলামের বহুবিবাহের বিধান, তালাকের বিধানের সহজতা এবং পর্দার বিধানের উপর বাজেভাবে আক্রমণ করেন।

ইন্ডিয়ায় স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) মুসলিম পুনর্জাগরণের নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রোগ্রাম প্রস্তাব করেন। তার এ প্রস্তাবনার মূল কথা হলো ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের সাথে সর্বাত্মক 'সহযোগিতামূলক' সম্পর্ক বজায় রাখা। তিনি উনিশ শতকের তথাকথিত উদারতাবাদী মতাদর্শের আলোকে ইসলামকে ব্যাখ্যার প্রয়াস পান। তৎকালীন ব্রিটিশ সংস্কৃতি ছিল এই মতাদর্শের ধারক-বাহক। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই মূলত সত্যকে জানার প্রথম উপায়। মানবজীবন পরিচালিত হবে মানুষের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের পথ ধরে। মানবজীবনের ধারা প্রাকৃতিকভাবেই এই বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে ক্রমধাবমান এবং এটাই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় সম্ভাবনাকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করবে। এই মতাদর্শে সুখী জীবনের অর্থ হলো, সবকিছুর ওপরে বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করা। আহমাদ খানের আরেকটি মতবাদ হচ্ছে, ইসলাম হলো কেবল কুর'আনের স্পিরিট বা

www.pathagar.com

মর্মকথা, এর থেকে বেশি কিছু নয়। আর কুর'আনের মর্মকথায় তিনি খুঁজে পান প্রাকৃতিক জগতকে স্বীকার করে নেওয়ার এক উদাত্ত আহ্বান, বৈষয়িক দিক থেকে ভালো থাকার একটি চেতনা এবং প্রবল কর্মস্পৃহা। তিনি তার এই তত্ত্বের নামকরণ করেছিলেন একটি আরবিয় ইংরেজি শব্দে, 'নেচারিয়া' বা ইংরেজিতে naturalism, বাংলায় প্রকৃতিবাদ বা স্বভাববাদ। তিনি এই মতবাদকে মুসলমানদের মধ্যে একটি সংস্কারমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, তার এই তত্ত্ব কোনো গ্রহণযোগ্যতাই পায়নি; 'উলামায়েকেরাম তার অসার যুক্তিকে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন।

তবে অধিক যুক্তিবাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে, সচ্ছল শ্রেণির মুসলিমদের মধ্যে সে বেশ একটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাই অনেকে ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে তার স্থাপিত অ্যাংলো-মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রতি সমর্থন জানায়। এ কলেজে একদিকে ইসলাম ধর্মের কিছু শিক্ষা দেওয়া হতো, অপরদিকে এটি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে ইংরেজিতে শিক্ষাদান করা হতো। এই কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্ররা ব্রিটিশদের ব্যবসায়িক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেত। আর একই সাথে তারা কাগজে-কলমে নিজেদের মুসলিম পরিচয়ও অক্ষুণ্ন রাখতে পারত।[৩৮] একটা সময়ে এসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় সমাজতন্ত্রের উর্বর-ভূমিতে। আজও পর্যন্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি চিন্তা-চেতনা শক্তিশালী কোনো স্থান দখল করতে পারেনি।

সচ্ছল শ্রেণির মুসলিমরা আহমাদ খানের রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে তার নেতৃত্বে অগ্রসর হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের সাথে শিক্ষিত মুসলিমদের একটি বিশেষ মৈত্রী গড়ে তোলা। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা, তাদেরকে আধুনিক যুগের উন্নতির সোপান মনে করা এবং ভারতের এগিয়ে যাবার পথে তাদেরকে আলোর দিশারীরূপে গ্রহণ করে নেওয়া।

অবশ্য তার ছাত্রদের কেউ কেউ এই নীতি থেকে কিছুটা সরে আসেন। তারা তাদের মতবাদকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রগতিশীলতার পথ ধরেন। উদারপন্থী হলেও তারা মূলত প্রাচীন 'আব্বাসীয় যুগের মতো করে ইসলামের ব্যাখ্যা করতেন। কেননা 'আব্বাসী যুগেও

(৩৮) ঐ .. পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৬।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক উদারতা ছিলো এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। এটাকে তারা একটি অনুসরণীয় মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা ঘোষণা করেন, পশ্চিমারা বিজ্ঞান ও অগ্রগতি শিখেছেই ইসলামি সভ্যতার কাছ থেকে; সুফিবাদের যুগে এসেই ইসলাম তার জৌলুস হারিয়েছে এবং উন্নতির ধারাবাহিকতা থেকে ছিটকে পড়েছে। কাজেই তারা যদি আবার তাদের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে চায় তাহলে তাদেরকে তাদের হারানো সভ্যতা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এযুগে তা হবে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হবার মাধ্যমে।[৩৯]

আন্দোলনসমূহ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনেকগুলো আন্দোলন এবং দলের জন্ম হয়, যেগুলো মুসলিম ভূমিতে ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনার এবং মুসলিমদের ঈমান 'আক্বীদাহ ও বিভিন্ন আচার-প্রথা সংশোধনের দিকে আহ্বান করে। বিংশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল হাসান আল বান্নার (মৃত্যু ১৯৪৯) নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মিশরের ইখওয়ানুল-মুসলিমীন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে সায়্যিদ আবুল আলা মাওদুদীর (১৯০৩-১৯৭৯) নেতৃত্বে গঠিত জামা'আতে ইসলামি।

দুটো আন্দোলনই সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের মদদপুষ্ট বা তাদের আজ্ঞাবাহী নব্য সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনকে উৎখাত করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানায়। অনিবার্যভাবে তারা শাসকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ইখওয়ানের একজন সদস্য, জামাল 'আবদুন-নাসির ক্ষমতা দখল করে ঠিকই, কিন্তু তারপরই সে তার ভোল পালটে ফেলে। সুকৌশলে আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের জড়ো করে সে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে সে তাদের উপর ঘৃণ্য নির্যাতন চালায় এবং অনেককেই হত্যা করে। বাধ্য হয়ে ইখওয়ান একরকম আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। তারা একটি গুপ্তদলে পরিণত হয়ে কমিউনিস্ট কাঠামোর অনুসরণে ছোট ছোট সেল গঠন করে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে

(৩৯) ঐ .. পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৬।

www.pathagar.com

যেতে থাকে। এরা সদস্যদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান একসময় সদস্য সংগ্রহের আহ্বানে রূপান্তরিত হয়। নতুন সদস্যদের 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস ও 'আমাল-আখলাক সংশোধনের জন্য সামান্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো। কেননা এ পর্যায়ে এসে দল ভারী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। 'আক্বীদাহ সম্পর্কিত বিতর্কিত বিষয়সমূহ উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে—এই যুক্তিতে দীনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতো। আর যে সকল সদস্য নির্যাতন ও কারাভোগ থেকে বাঁচতে এবং পড়াশোনার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা দেশে গমন করেছিল তারা নতুন সদস্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ছাত্রসংস্থা গড়ে তোলে। যেমন, F.O.S.I.S, M.S.A এবং I.S.N.A।

একই সময়ে আরও একটি আন্দোলন বেড়ে ওঠে ভারতে। এটি ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, যা তাবলীগ জামা'আত নামে পরিচিত। মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াস এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদেরকে মাসজিদমুখী করা। কেননা দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে মাসজিদগুলো প্রায় একেবারেই জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য উপমহাদেশের বড় বড় সুফি সম্প্রদায়গুলোর আত্মিক শিক্ষা আত্মস্থ করার সাথে সাথে তারা বাহ্যিক চর্চা হিসেবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সফর করার রীতি চালু করেন। এই আন্দোলনের অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলিম কিংবা অমুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই তা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু এ দলের মধ্যেও কুর'আন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র আলোকে 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস ও 'আমাল সংশোধনের প্রতি তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। তাদের প্রধান পাঠ্য বই, 'তাবলীগি নিসাব', অসংখ্য জাল এবং দুর্বল তথ্যে ভরা। এই আন্দোলনের মধ্যেও অন্ধ অনুসরণের ধারা অব্যাহত রাখা হয়। কারণ তা ছিল নতুন সদস্য জোগাড় করার পক্ষে অধিক সহায়ক।

উল্লিখিত আন্দোলনগুলো ছাড়াও একই সময়ে আরও কিছু আন্দোলনের জন্ম হয়। এ আন্দোলনের লোকেরা অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করতেন এবং কুর'আন সুন্নাহকে সহাবা, তাবেয়ীনগণের পদ্ধতি অনুযায়ী অনুসরণের

www.pathagar.com

দিকে আহ্বান জানাতেন। এই দলগুলো সালাফি আন্দোলন নামে পরিচিত। মিশরে আনসার উস-সুন্নাহ নামে এই আন্দোলন গড়ার কারিগর ছিলেন শাইখ হামিদ আল-ফিক্‌হি, 'আব্দুর-রহমান আল-ওয়াকীল এবং 'আব্দুর-রাযযাক হামযাহ। ভারতে এই আন্দোলন সূচনা করেন শাইখ সানাউল্লাহ আমৃতসারি। সালাফি দলগুলো মুসলিমদের 'আক্বীদাহ বিশ্বাস এবং রীতি-রেওয়াজের সংশোধনকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত মনে করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন। রাজনৈতিক জগতে যে দলাদলির জন্ম হয়েছিল তারা তার বিরোধী ছিলেন। একই সাথে তাবলীগি আন্দোলনের 'ইল্‌ম অর্জনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এ যুগের একজন সেরা হাদীস্ বিশারদ, নাসির আদ-দীন আল-আলবানি সিরিয়ায় ইসলামি পুনর্জাগরণকে উজ্জীবিত করেন। একই কাজ সৌদি আরবে করেছিলেন শাইখ ইব্‌ন বায এবং শাইখ ইব্‌ন 'উসাইমিন। ইয়েমেনে একই ধারায় কাজ করে যান ইমাম আলবানির এক ছাত্র, শাইখ মুকবিল ইব্‌ন হাদী।

মাযহাব অনুসরণের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে যে কদর্য দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিলো, তা এবার ফিরে এল নানা রকম দলীয় আন্দোলনের রূপে। এই দলগুলোর সবারই কমবেশি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো নিজেদের সংগঠনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং অন্য দলগুলোকে এড়িয়ে চলা। দলের আমীরের কাছে তারা যে ধরনের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করত, তা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাহর কাছেই করা যেতে পারে। মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু অর্জন করলেও পুনর্জাগরণের জন্য অপরিহার্য যে প্রয়োজনটি পূরণ করা হয়নি তা হলো বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস। মুসলিম জাতিকে অবশ্যই ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা এবং মাসজিদমুখিতার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু যে বিষয়টির দিকে সর্বাধিক মনোযোগ দিতে হবে তা হলো ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিল 'আক্বীদাহ-বিশ্বাসের সংশোধন।

আলজেরিয়াতে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশকে অনেক মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তা ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনতে

www.pathagar.com

পারেনি। কারণ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মজবুত বিশুদ্ধ 'আকীদাহ না থাকার কারণে কমিউনিস্টরা এই বিপ্লবের সুফল হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়। আফগানিস্তানে রাশিয়ান কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কম্যুনিস্ট সরকারের পতন ও রাশিয়ান বাহিনীকে আফগান ভূমি থেকে তাড়াবার পরে তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মিশরে ইখওয়ানুল-মুসলিমীন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিচয়ে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতা ও অপরিপক্ব চিন্তার কারণে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই ধৈর্যটুকু ধরতে রাজি হয়নি। কারণ তারা ভেবে বসে যে, ইরানে 'ইসলামি পুনর্জাগরণ'-এর ঢেউ উঠেছে এবং এক পর্যায়ে 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিতও হয়ে গেছে। এমনকি ইখওয়ানের অনেক সদস্য খোমেনিকে খলীফাহ মেনে তার কাছে আনুগত্যের শপথ করে বসে। ইখওয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু সদস্য 'তাকফীর ওয়াল-হিজ্‌রাহ', 'জামা'আতুল-জিহাদ' এবং 'আল জামা'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে দল গঠন করে এবং ঝটিকা ক্ষমতা দখলে তৎপর হয়। চরমপন্থী কিছু বিশ্বাসের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে সহিংসতার একটি ভাবধারা জন্ম নেয়। তারা সকল মুসলিম শাসক এবং তাদের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ঢালাওভাবে কাফির ঘোষণা করে বসে। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সা'দাতকে হত্যা করা হয় দেশে জোর করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু ফলাফল হয় উল্টো। সা'দাতের উত্তরসূরী হোসনি মোবারক আরও বেশি কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে এবং ইখওয়ানের আদর্শে বিশ্বাসী নাগরিকদের প্রতি প্রচণ্ড খড়গহস্ত হয়। ভয়ানক সহিংসতার মুখে মুসলিমদের পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে পড়ে।

সিরিয়াতেও একই রকম ঘটনা ঘটানো হয়। সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে হোমস এবং হামা শহরে ইখওয়ান বিদ্রোহ করে। তারা আশা করেছিল সিরিয়ার জনসাধারণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সুন্নি মুসলিম হলেও শাসনকর্তৃত্ব একটি চরমপন্থী শিয়া গোষ্ঠী নুসাইরিয়াদের হাতে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাফিয আল আসাদও ছিল সেই নুসাইরিয়াহ বা আলাউই শিয়া গোষ্ঠীর লোক। তাই সরকারী বাহিনীতে আর্টিলারি, ট্যাংক

www.pathagar.com

এবং প্লেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কেবল শিয়াদেরই নিয়োগ দেওয়া হতো। আর সুন্নি মুসলিমরা ছিল কেবল পদাতিক সৈন্য। তাই হাফিয আল আসাদ রণতরীর সাহায্যে হোমস এবং হামাতে ইখওয়ানের উপর আক্রমণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের দমন করে ফেলে। ইখওয়ান ইরানের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। ইরানী শিয়ারা পূর্বে নুসাইরিয়াহদেরকে শিয়া ধর্ম থেকে বহিস্কৃত মনে করলেও, তাদের বিরুদ্ধাচরণস্বরূপ ইখওয়ানের প্রতি তারা মোটেই সহানুভূতি দেখায়নি। বরং সুন্নি হিসেবে ইখওয়ানিদেরকে হত্যা ও তাদের নারীদেরকে ধর্ষণের পুরস্কারস্বরূপ খোমেনি হাফিয আল আসাদকে মূল শিয়া ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় গ্রহণ করে নেয়।

আলজেরিয়াতে এফ.আই.এস মুভমেন্ট নামে একটি আন্দোলন জন্ম নেয় যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আলজেরিয়ার সামরিক সরকার ইসলামপন্থীদের অনুকূলে আসা নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করে দেয় এবং এফ.আই.এস এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে বন্দি করে। ফলে বাধ্য হয়ে, মিশরের মতো আলজেরিয়াতেও এই আন্দোলনের নেতাকর্মীরা গোপনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এরপর তাদের একটি সামরিক শাখা গঠন করা হয় যা শহর এলাকায় গেরিলা কায়দায় অপারেশন চালাতে থাকে। তা প্রতিহত করতে সরকার একটি গুপ্ত দল গঠন করে জি.আই.এ নামে, যারা বিভিন্ন স্থানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তার দোষ ইসলামি আন্দোলনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত এবং জনগণকে এফ.আই.এস এর ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য বাধ্য হয়ে পরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। 'আক্বীদাহ-বিশ্বাসের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে এই আন্দোলনটি খুব সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা তাদের আন্দোলনকে আরও অনেক বছর পেছনে ঠেলে দেয়।

www.pathagar.com

মৌলবাদ

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক, সালাফি-মাযহাবি তথা দল-মত-পথ নির্বিশেষে সকল মুসলিমের উপরে মৌলবাদী লেবেল এঁটে দেয় পশ্চিমারা। এ কাজে তারা ব্যবহার করে তাদের তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমকে। P.L.O'র মতো রাজনৈতিক চরমপন্থী দল থেকে শুরু করে মিশরের জিহাদ মুভমেন্টের মতো ধর্মীয় চরমপন্থীসহ দল-মত-পথ নির্বিশেষে সকলকেই কম-বেশি সন্ত্রাসী এবং মৌলবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল উইলি ক্লেইসের দেওয়া একটি উক্তি তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন,

> "মুসলিম মৌলবাদ কোনোভাবেই সেকালের সমাজতন্ত্র থেকে ছোট হুমকি নয়। এই আশংকাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ...। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামি মৌলবাদ বর্তমান বিশ্বের জন্য একটি গুরুতর হুমকি। কারণ এটি সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় উগ্রপন্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য বিনষ্টের এক মোক্ষম হাতিয়ার।"(৪০)

এমনিতে 'মৌলবাদ' বলতে বোঝানো হয় প্রোটেস্টান্টদের ধর্মতত্ত্বভিত্তিক একটি আন্দোলনকে; যার মূল ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যে, বাইবেলের প্রতিটি অক্ষরই ঐশ্বরিক। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রবণতা শুরু হলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উনিশ শতকে অ্যামেরিকায় এই আন্দোলনটি বিস্তার লাভ করতে থাকে। খ্রিষ্টান ধর্মের শিক্ষার সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমন্বয় সাধনের উদার নৈতিক প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয় এই মৌলবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে।

শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থে, প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই মৌলবাদী হতে হবে। কারণ তারা প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল কুর'আন শতভাগই আল্লাহর কথা। এমন কোনো মুসলিম 'আলিম নেই যিনি কুর'আনের প্রামাণিকতা বা সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে

---

(৪০) ইন্টার প্রেস সার্ভিস দ্বারা বিবৃত, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, 'ইসলামোফোবিয়া এ চ্যালেঞ্জ ফর আস অল' এ উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৯।

www.pathagar.com

অতীত ও বর্তমানের সকল 'আলিমদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, কেউ যদি আল-কুর'আনের একটি শব্দকেও অস্বীকার করে, তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

সমাধান

এই সংকটপূর্ণ অবস্থায় মুসলিম জাতির প্রথম ও মূল করণীয় হলো ইসলামি 'আকীদাহ-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে ফিরে যাওয়া। ইসলামি জ্ঞানের সঠিক উৎস এবং এই জ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যাতে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই এ সমস্যা সমাধানের পথ নিহিত আছে। এটি ছাড়া আর কোনো পথ নেই। ইমাম মালিক যেমনটা বলেছিলেন, "এই জাতির পরবর্তী প্রজন্ম কেবল তখনই নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারবে যখন তারা সেই পথ অবলম্বন করবে, যার দ্বারা প্রথম প্রজন্ম নিজেদেরকে সংশোধন করেছিলেন।" রসূল ﷺ বলেছেন, "এই মুসলিম উম্মাহ ৭৩ দলে ভাগ হবে, যার মধ্যে ৭২টিরই গন্তব্য হবে জাহান্নামের আগুন এবং কেবল ১টি দলই হবে জান্নাতী।"

এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন, এরা হলো তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সহাবিদের পথ অনুসরণ করে। এই পথকে বলা হয়, 'সালাফদের পথ'। এটা সেসব আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পথের মতো নয় যারা ভুল-ত্রুটির কারণে মানুষকে সম্পূর্ণ বর্জন বা পরিত্যাগ করে চলে যায়।

শাইখ নাসির উদ দীন আলবানি তার বিভিন্ন লেকচারে এ বিষয়ে বলেন যে, ভ্রান্ত দলকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা বর্তমান সময়ে অনুচিত। কেননা, যে উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পথের লোকদের পরিত্যাগ করার বিধান ইসলাম দিয়েছে, এখন এই পরিত্যাগ সে উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে। অতীতে যদি কেউ বিদ'আতে লিপ্ত হতো তাহলে তাকে বর্জন করার মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়া হতো যে, তার কাজটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। এর দ্বারা সে আবার সঠিক পথে ফিরে আসত। কিন্তু বর্তমান কালের মুসলিম জনসাধারণের সকলেরই কোনো না কোনো বিষয়ে কম বেশি ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। এ অবস্থায় ভুল-ত্রুটির কারণে মানুষকে বর্জন করা হলে অল্প কিছু লোকই অবশিষ্ট থাকবে যারা সঠিক মানহাজের উপরে আছে।

www.pathagar.com

তাই সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো, ধৈর্যের সাথে উপদেশ দেওয়া এবং ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সংশোধনের কাজ চালিয়ে যাওয়া, যেন তা পরিবর্তনের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। যেমনটা রসূল ﷺ নিজেই বলে গেছেন,

"দীন মানেই কল্যাণকামিতা।"(৪১)

(৪১) সহীহ মুসলিম, পরিচ্ছেদঃ বায়ানু আন্না আদ-দীন আন-নাসীহাহ, খণ্ড-১।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি সংস্কৃতি

ইসলামি সংস্কৃতি হলো কেবল সে সকল ঐতিহ্য বা রীতি-নীতি, যেগুলো ইসলামের সঠিক শিক্ষার অনুসরণে দিনে দিনে গড়ে উঠেছে। অথবা বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের মাঝে দেশ ও অঞ্চল নির্বিশেষে যেসব বিষয় অভিন্ন সেগুলোই 'ইসলামি সংস্কৃতি'র মূল অংশ এবং যেগুলো ভিন্ন সেগুলো 'মুসলিম সংস্কৃতি'র বিভিন্ন রূপ।

যেমন মুসলিম নারীদের পোষাকের রং, ডিজাইন কিংবা কাপড়ের ধরনের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। মুসলিম দেশগুলোর সংস্কৃতির ভিন্নতা হেতু এগুলো একেক দেশে একেক রকম। কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতির অভিন্ন যে নীতিটি স্থান-কাল-পাত্রভেদে সকলেই ধারণ করে, তা হলো পর্দাব্যবস্থা। এটা মুসলিম পুরুষদের পোষাকের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। ডিজাইন এবং রঙের ভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামি সংস্কৃতির মূলনীতি অতীতে অক্ষুণ্ন ছিল। পুরুষদের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢিলেঢালা কাপড়ে ঢাকা থাকত—হোক সেটা প্যান্ট, জোব্বা কিংবা লুঙ্গির মাধ্যমে। সেগুলো যেমন আঁটসাঁট হতো না, তেমনি টাখনুর নিচেও নামত না। পুরুষরা সিল্ক বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো উজ্জ্বল হলদে কমলা রংয়ের পোশাক পড়ত না। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম পুরুষরা পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক পরে। তারা এমন ধরনের প্যান্ট পরে যেগুলো দেখলে মনে হয়, যেন লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এগুলো ডিজাইন করা, এবং সেগুলো টাখনুর নীচে ঝুলে থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামের ভিত্তি

ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা দুটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

২. ঈমানের ছয়টি মূলনীতি

এই বিন্যাসটি করা হয়েছে হাদীসে জিবরীল হিসেবে সুপরিচিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে, যে হাদীসে ''উমার বিন খাত্তাব ﷺ (১) বলেন,

"একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তাঁর পরনের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার চুল ছিল কালো কুচকুচে। তাঁর মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নাবি ﷺ এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তাঁর দুই হাত নাবি ﷺ এর দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ﷻ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল; সলাত কায়েম করবে, যাকাত(২) আদায় করবে, রমাদানের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ(৩) পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। এরপর আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান(৪) সম্পর্কে অবহিত করুন। রসূল ﷺ বললেন: ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহসান

---

(১) ইসলামের দ্বিতীয় খলীফাহ

(২) যাকাতকে প্রায়ই 'দান' বা 'গরিবের হক' বলে অভিহিত করা হয়, এটি একটি করস্বরূপ যা মুসলিমদের সম্পদের উপর ধার্য করা হয় এবং গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

(৩) মক্কার মাসজিদুল হারাম।

(৪) ঈমান বলতে সাধারণভাবে 'ধর্মীয় বিশ্বাস'কে বোঝানো হয়।

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলুন। রসূল ﷺ বললেন: ইহসান[৫] হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখ, তাহলে (অন্তত মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামাত[৬] সম্পর্কে বলুন। রসূল ﷺ বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি বেশি কিছু জানেন না। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে বলুন। রসূল ﷺ বললেন: তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর[৭] জননী হবে; আর তুমি দেখবে নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ, দরিদ্র মেষপালকরা বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা করছে ও তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করছে। 'উমার ইব্ন খাত্তাব বললেন যে, তারপর আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে 'উমার! তুমি কি জানো, এই প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। রসূল ﷺ বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে তিনি তোমাদের মাঝে এসেছিলেন।"[৮]

---

(৫) এখানে ইহসান শব্দটি একটি বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করছে। ইহসান শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থ আছে, যেমন, 'সঠিক কাজ', 'ধার্মিকতা', 'উৎকর্ষ', 'আন্তরিকতা' ইত্যাদি। ইহসানের মূল শব্দের একটি অর্থ হলো 'কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করা বা দক্ষ হওয়া'। তবে, এক্ষেত্রে শব্দটির যেকোনো একটি অর্থ গ্রহণ করলে ইহসান শব্দটির ব্যাপকতার উপর অবিচার করা হয় এবং ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কা থাকে।

(৬) কিয়ামাহ বা বিচার দিবস।

(৭) এ শব্দের বহুবিধ অর্থ বা ব্যাখ্যা হতে পারে। ইমাম নাওয়াউই তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, দাসী মহিলা স্বাধীন পুত্র এবং কন্যার জন্ম দেবে এবং সেই সন্তান তাদের জন্মদাত্রী মায়ের মনিব হবে। এখানে আরবিতে 'আমাহ' শব্দটি এসেছে, যেটিকে সাধারণভাবে 'মহিলা দাসী' হিসেবে অনুবাদ করা হয়। তবে এর দ্বারা যেকোনো মহিলাকেও বোঝানো যেতে পারে এই অর্থে যে, আমরা সকলেই আল্লাহর দাস। কাজেই এই হাদীসটির অর্থ এমনও হতে পারে: "যখন কোনো মহিলা তার মনিবকে পেটে ধরবে", অর্থাৎ সন্তানরা মাকে সম্মান করবে না এবং মায়ের সাথে তারা দাসীর মতো আচরণ করবে। ব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন যে, এই হাদীসে রাব্বাহ (নারী প্রভু) শব্দটি নারীবাচক হলেও এর দ্বারা পুরুষবাচক শব্দ রাব্ব (প্রভু)কেও বুঝাতে পারে।

(৮) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ১-৩, হাদীস নং ১।

www.pathagar.com

নৈতিকতা

নীতিবোধ মানুষের ভালো ও মন্দ আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর নৈতিকতা হলো সদাচরণের নীতি মেনে চলার একটি গুণ। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'আমরা কীভাবে বুঝব—কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ?' কেননা, ভালো এবং মন্দের সংজ্ঞা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বিষয়টি বিচার করা হচ্ছে তার ওপর।

নৈতিকতার মানদণ্ড

১. দর্শন

পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্যক্তিগত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার নৈতিকভাবে ভালো বা গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দর্শনে এই একই কাজ মন্দ হিসেবে বিবেচিত।

২. সংস্কৃতি

কোনো সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি ঐতিহ্য অপর কোনো সমাজের কাছে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একবার পাপুয়া নিউগিনির জাতীয় নৃত্যদলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার একাধিক স্থানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য; কিন্তু বাধ সাধেন অস্ট্রেলিয়ার এক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার স্কুলে নৃত্য পরিবেশনে আপত্তি জানানোর কারণে প্রচার মাধ্যমে তাকে সংকীর্ণমনা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন তার অবস্থানে অনড় এবং নগ্নবক্ষা নৃত্যদলকে তিনি নাচ পরিবেশনের অনুমতি দেননি।

৩. সামাজিক আবশ্যকতা

চীনে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করা হয়। তাই সেখানে কোনো মহিলা যদি দ্বিতীয়বারের মতো অন্তঃসত্ত্বা হন, তবে সে সমাজে তা নৈতিকভাবে ভুল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

অ্যামেরিকা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়েছিল তখন নিজ দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়। অথচ পরবর্তীতে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো এ ধরনের নিউক্লীয় পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মতো যেসব দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়, তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

৪. পেশাগত প্রয়োজন

নীতিগতভাবে মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ তাদের রোগীদের কোনো তথ্য ফাঁস করেন না। এমনকি তার কোনো রোগী যদি শেষ পর্যন্ত মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পেশাদার খুনীতে পরিণত হয় এবং তাতে জনমানুষের জীবন বিপন্নও হয়ে পড়ে, তবুও তারা রোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেন!

৫. ধর্ম

ক্যাথলিক পাদ্রী ও নানদের জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এছাড়া, যখন কোনো ব্যক্তি তাদের কাছে নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তা যতো মানুষের জীবনের জন্যই হুমকি হোক না কেন, নীতিগত কারণে তারা তা গোপন রাখেন।

গণতন্ত্রে নৈতিক মূল্যবোধ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিরুচির ভিত্তিতে। এ কারণেই এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের শাশ্বত কোনো ভিত্তি নেই। নৈতিকতা এখানে কখনোই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় মানুষের সাথে তার স্রষ্টা, অন্যান্য মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে। ইসলামে একটি সাধারণ নীতি হলো, আল্লাহর উপাসনা সর্বোত্তম কাজ এবং সৃষ্টির উপাসনা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। জীবন বাঁচানো ভালো, আত্মহত্যা পাপ। প্রয়োজনে পশু-পাখি শিকার করা বৈধ, কিন্তু অপ্রয়োজনে পশু-পাখি হত্যা একটি অপরাধ।

ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি

১. ইসলামে ভালো এবং মন্দ নির্ধারিত হয় আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী। সকল কাজের চূড়ান্ত ফলাফল একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই একমাত্র তিনিই সঠিকভাবে ভালো ও মন্দকে নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন। ভালো এবং মন্দকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে—যা কিছু আল্লাহ ﷻকে সন্তুষ্ট করে তা-ই ভালো এবং যা কিছু তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তা-ই মন্দ।

২. আল্লাহ ﷻ যা কিছুকে হালাল করেছেন তার মধ্যে অবশ্যই কোনো কল্যাণ আছে এবং যা কিছুকে হারাম করেছেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অকল্যাণ আছে; সেটা আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক। আল্লাহ ﷻ নিছক খামখেয়ালীবশত কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম হারাম নির্ধারণ করেননি।

www.pathagar.com

ইসলামে নৈতিকতার মূল সূত্রাবলি

১. জ্ঞান

নৈতিক দিক থেকে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে; অন্তত জানতে হবে, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। রসূল ﷺ বলেছেন, "তিন শ্রেণির ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি, ঘুম থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত; অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল, বিবেক-বুদ্ধি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত।"(৯) অর্থাৎ নৈতিক দিক থেকে শিশু, পাগল এবং অচেতন ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ নয়।

২. সম্মতি জ্ঞাপন

ভুলে বা দুর্ঘটনাক্রমে কিছু সংঘটিত হলে কিংবা জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে কিছু করানো হলে তার দায়ভার থেকে সে মুক্ত। রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের উপর থেকে দুর্ঘটনাক্রমে, জোরজবরদস্তির কারণে এবং অজ্ঞতাবশত করা কাজের দায়ভার তুলে নেওয়া হয়েছে।"(১০)

৩. বিশুদ্ধ নিয়্যাত

রসূল ﷺ বলেছেন, "কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে তা-ই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।"(১১)

৪. তাক্বওয়া

রসূল ﷺ বলেছেন, "ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করা, যেন তুমি তাকে দেখছ, যদি তুমি তাকে না-ই দেখতে পাও, অন্তত মনে করো, যেন তিনি তোমাকে দেখছেন।"

---

(৯) আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪০৩, হাদীসটি 'আলি ﷺ থেকে বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ সূত্রে বর্ণিত; 'আ'ইশাহ ﷺ এবং ইব্ন 'আব্বাস ﷺ থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
(১০) ইব্ন মাজাহ ও আল বাইহাকি।
(১১) সহীহ আল-বুখারি

www.pathagar.com

ইসলামে উত্তম নৈতিক চরিত্রের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসূল ﷺ যেন গোটা ইসলামের সারসংক্ষেপ এভাবে তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে,

"নিশ্চয়ই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা আনয়নের জন্য।" (১২)

আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

"আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" [আল-কলাম, ৬৮:৪]

ইব্ন 'আব্বাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে চরিত্র বলতে 'দীন ইসলাম' বোঝানো হয়েছে।(১৩) এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ ধর্মীয় নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। 'আ'ইশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে রসূল ﷺ এর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দেন,

"কুর'আনই হলো তাঁর চরিত্র।"(১৪)

অর্থাৎ তার আচার-আচরণ ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক। কাজেই, সচ্চরিত্র গড়ে তোলার উপায় হলো কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র যথাযথ অনুসরণ। এ বিষয়ে আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেন,

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ..."
[আল-আহ্‌যাব, ৩৩:২১]

---

(১২) আবু হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম বুখারি হাদীস্‌টিকে 'আল-আদাব আল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং আল-হাকিম ও আল-বাইহাকি 'শু'আব আল-ঈমান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সহীহ্‌ আল-জামি' আস-সাগীর গ্রন্থে এই হাদীস্‌টিকে সহীহ্‌ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৪৬৪, হাদীস্‌ নং ২৩৪৯।

(১৩) তাফসীর আল-কুর'আন আল-'আযীম, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ৪২৯।

(১৪) সহীহ্‌ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৬০, হাদীস্‌ নং ১৬২৩; সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫২, হাদীস্‌ নং ১৩৩৭ এবং মুসনাদে আহমাদ।

www.pathagar.com

সুতরাং, ইসলামে ধর্ম-কর্ম থেকে উত্তম আচার-ব্যবহারকে আলাদা করা যাবে না। রসূল ﷺ বলেছেন,

"উত্তম চরিত্রই হলো ধার্মিকতা।"(১৫)।

জীবনধারণের সঠিক উপায় দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপন করতে শেখায়। যার চরিত্র উত্তম নয়, যে অন্যদের গালি দেয় কিংবা মিথ্যা বলে; হয় সে মুনাফিক, নতুবা অত্যন্ত দুর্বল ঈমানের মুসলিম। একজন মুসলিমের ঈমানকে কখনো তার আমল থেকে পৃথক করা যায় না। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"সে ব্যক্তিই ভালো মু'মিন, যার চরিত্র উত্তম।"(১৬)

এ কারণে, কুর'আনের যেখানেই ঈমান আনয়নের আদেশ এসেছে, সেখানেই সৎকাজের নির্দেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একই ধারা লক্ষ্য করা যায় রসূল ﷺ এর হাদীসেও। যেমন, তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ ﷻ ও আখিরাতের প্রতি যে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।"(১৭) ।

এ যুক্তির আলোকে, ইসলামের প্রতিটি শিক্ষারই একটি অন্তর্নিহিত নৈতিক মূলনীতি রয়েছে।

বস্তুত ইসলামে মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি দিক সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কাজেই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে নীতিবোধের একটি সুনির্দিষ্ট সংযোগ থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এই নীতিবোধই মানুষের সাথে তার স্রষ্টা, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, আল্লাহ

(১৫) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ১৩৫৮-৯, হাদীস নং ৬১৯৬।
(১৬) সহীহ সুনান আত-তিরমিযি, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৩৪০, হাদীস নং ৯২৮।
(১৭) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৩২, হাদীস নং ৭৬।

www.pathagar.com

ﷺ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা নৈতিকভাবে ভুল এবং একটি অমার্জনীয় কাজ। একইভাবে, মিথ্যা বলা কিংবা পরিবেশ দূষিত করা নীতিগতভাবে আপত্তিকর। মূলত ইসলাম এবং ঈমানের প্রতিটি স্তম্ভই কোনো না কোনো নৈতিক গুণ অর্জনে সহায়তা করে। তাই কেউ যদি এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যসমূহ অনুধাবন করতে না পারে, তবে পড়ে থাকবে নিছক কিছু অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, যা আখিরাতে হয়তো ব্যক্তির কোনো উপকারেই আসবে না।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহ

১. শাহাদাহ বা ঈমানের সাক্ষ্য

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ', যার আক্ষরিক অর্থ, 'আল্লাহ ﷻ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল'। কিন্তু এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় জানতে হবে:

ক. যদিও এই শাহাদাহ্‌র প্রথম অংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আক্ষরিক অর্থ হলো, 'আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।' তবে দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আরও অনেকের, অনেক কিছুর উপাসনা করা হয়। প্রতিটি ধর্মেই তাদের নিজেদের এক বা একাধিক উপাস্য রয়েছে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, এসব উপাস্যই মিথ্যা। কেবল দেব-দেবীর নামের ভিন্নতার কারণে তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়নি, বরং প্রকৃত অর্থেই এরা কেউ স্রষ্টার গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। শাহাদাহ্‌র প্রথম অংশের দাবি হলো, সকল উপাস্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে কেবল একজন প্রকৃত মা'বুদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা, যিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ ﷻ। কাজেই, ঈমানের সাক্ষ্যের প্রথম অংশের সঠিক অনুবাদ হলো, 'আল্লাহ ﷻ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই।'

যে ব্যক্তি যথাযথ জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সাক্ষ্য দেবে, সে মুক্তির পথের দিশা লাভ করবে। 'উসমান ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন,

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ইন্তিকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(১)

আর কেউ যদি কাউকে বিয়ে করার জন্য কিংবা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য এই সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তা আখিরাতে তার কোনোই উপকারে আসবে না। কেউ যদি কেবল বিয়ের উদ্দেশ্যে এই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সেই বিয়েরও কোনো বৈধতা নেই। যদি কোনো মুসলিম নারী জেনে-শুনে এমন কোনো অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সে ব্যভিচার করল।

অপরদিকে, কেউ যদি প্রকাশ্যে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে, যতক্ষণ তার কোনো কথা বা কাজে ইসলামের বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়। উসামাহ ইব্ন যাইদ ﷺ বলেন,

"রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জুহায়ানা গোত্রের হুরাকা শাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। আমরা খুব ভোরে সেখানে পৌঁছলাম এবং যুদ্ধে আমি এক ব্যক্তির মুখোমুখি হলাম। আমি তার উপর বর্শা দিয়ে আঘাত হানতে গেলে সে বলে ওঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তারপরও আমি তাকে হত্যা করলাম। পরে আমি রসূল ﷺ এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি উল্লেখ করি। তিনি বললেন: সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো এ কথা আমার অস্ত্রের ভয়ে বলেছিল। তিনি বললেন: তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ যে, সে ঈমান এনেছে কি আনেনি? তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে, আহ! আমি যদি আজকেই প্রথম ইসলাম কবুল করতাম!"(২)

২. ঈমানের সাক্ষ্যের দ্বিতীয় অংশ, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর আক্ষরিক অনুবাদ হলো, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর একজন রসূল'। তবে কথাটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর রয়েছে গভীর তাৎপর্য।

১. সাক্ষ্যের এই অংশটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, রসূল ﷺ-কে জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ

(১) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ১৯, হাদীস নং ৩৯।
(২) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৫৬, হাদীস নং ১৭৬।

www.pathagar.com

মেনে চলা, সেগুলোর তাৎপর্য আমাদের কাছে বোধগম্য হোক বা না হোক। এই ধরনের নিঃশর্ত আনুগাত্যের কারণ হলো, রসূল ﷺ এর সকল আদেশ-নিষেধই ওয়াহ্‌য়িনির্ভর। কোনোটাই তাঁর নিজের মনগড়া নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, **"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওয়াহ্‌য়ি, যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়।"**(৩) রসূলের আনুগাত্য করাই হলো আল্লাহর আনুগাত্য করা। কেননা আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন, **"যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে, সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল।"**(৪) অন্যদিকে নেতৃস্থানীয়দের যে আনুগাত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা শর্তসাপেক্ষ। রসূল ﷺ বলেছেন, *"আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো কোনো আনুগত্য নেই। আনুগাত্য কেবলমাত্র বৈধ কাজে।"*(৫)

২. মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বশেষ নাবি বা খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে বিশ্বাস করা। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন, **"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নাবি।"**(৬) রসূল ﷺ নিজেও বলেছেন, *"আমার সাথে আমার পূর্ববর্তী নাবিদের উপমা হলো এমন—যেন এক ব্যক্তি একটি ভবন নির্মাণ করল; একে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক কোণায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেন ? নাবি ﷺ বলেন, আমিই সেই ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবি।"*(৭)

৩. প্রকাশ্যে সাক্ষ্য প্রদান: ঈমানের সাক্ষ্য প্রকাশ্যে প্রদান করতে হবে। তবে এতে যদি কারো জীবনের আশংকা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। উদাহরণস্বরূপ,

---

(৩) আন-নাজ্‌ম (৫৩):৩-৪।

(৪) আন-নিসা (৪):৮০।

(৫) ইমাম আহমাদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত এবং সহীহ্‌ আল-জামি' আস-সাগিরে বিশুদ্ধতা যাচাইকৃত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৫০, হাদীস্‌ নং ৭৫২০। ভিন্ন শব্দ সম্বলিত একই ধরনের আরেকটি বর্ণনা এসেছে সহীহ্‌ বুখারিতে, খণ্ড ০৯, পৃষ্ঠা ২৭১, হাদীস্‌ নং ৩৬৩ এবং সহীহ্‌ মুসলিমে, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০২২ এবং হাদীস্‌ নং ৪৫৩৫।

(৬) আল-আহযাব, (৩৩):৪০।

(৭) সহীহ্‌ আল-বুখারি, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ৪৮৩, হাদীস্‌ নং ৭৩৫ এবং সহীহ্‌ মুসলিম, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ১২৩৫, হাদীস্‌ নং ৫৬৭৫।

www.pathagar.com

মুসলিমদের প্রথম হিজ্‌রতকারী দলটিকে আশ্রয় দানকারী ইথিওপিয়ার রাজা নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি বেশিরভাগ লোকের কাছে গোপন রেখেছিলেন।

প্রকাশ্যে সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য আল্লাহকে অবহিত করা নয়। কেননা তিনি তো এমনিতেই জানেন কার অন্তরে কী আছে। কেউ ঈমান আনলে আল্লাহর কোনো লাভ নেই, কুফরি করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। প্রকাশ্যে সাক্ষ্যদানে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই, বরং উপকার আছে ব্যক্তির নিজেরই। ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা উচিত, যেন মুসলিম সম্প্রদায় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে।

তাছাড়া মানুষের ঈমান বাড়ে কমে। শয়তান সাধারণত মানুষকে তার ঈমানের দুর্বলতার সময়ে সকল শক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। তাই যদি নওমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কথা সমাজে কারো জানা না থাকে, তাহলে দুর্বলতার সময় তারা কাউকে পাশে পাবে না। এ কারণেই রসূল ﷺ বলেছেন, মুসলিমরা যেন সর্বদা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে রাখে। স্বয়ং আল্লাহ আমাদের সাবধান করে বলেছেন, যারা মুসলিম জামা'আতকে পরিত্যাগ করবে তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম।

শাহাদাহ্‌র ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ধারণা

আজকাল অনেক মুসলমানকে দেখা যায় যে, আরবি অক্ষরের চারুলিপিতে শাহাদাহ লিখে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে বসার ঘরে দেওয়ালে সাজিয়ে রাখে। মুসলিম শিশুরা কথা বলতে শুরু করলেই তাদেরকে এই কালিমা শিখিয়ে দেওয়া হয়। অথচ বংশানুক্রমিক এসব মুসলিমদের বাস্তব জীবনে কালিমার কোনোই প্রভাব নেই। তাদের প্রায় সকলেই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে জান্নাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। তারা মনে করে, তারা যা কিছুই করুক না কেন, মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলে আর একটি 'মুসলিম' নাম থাকলেই তারা জান্নাত পেয়ে যাবে। এটা একটা চরম ভ্রান্ত ধারণা। কারণ একমাত্র সত্যিকার ঈমানদাররাই কেবল জান্নাতে যাবে। খাইবার যুদ্ধের পর নিহত

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা বলাবলি করছিল যে, অমুক শাহীদ হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিছুতেই নয়। আমি তাকে গনীমতের মাল থেকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা জুব্বা পড়া অবস্থায় জাহান্নামে দেখেছি। তিনি তখন 'উমার ﷺ-কে বলেন, যাও, মানুষের মাঝে তিনবার ঘোষণা করে দাও যে, কেবল সত্যিকার বিশ্বাসীরাই জান্নাতে যাবে।(৮)

শাহাদাহ যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

ক. উদার মানসিকতা

মু'মিনদের মধ্যে আদর্শিক ব্যাপারে কোনো গোপনীয়তা থাকে না। তারা মুসলমান সমাজে দলাদলি, বিভক্তি কিংবা ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে গোপন তৎপরতা থেকে বিরত থাকে। কারণ এগুলোর প্রভাব সবসময়ই মন্দ। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে এরকম অসৎ উদ্দেশ্যে গোপনে মিলিত হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে বলেছেন,

"তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে তার গোপন পরামর্শে) যে নির্দেশ দেয় সদাকাহ কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে, অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব।" [আন-নিসা, ৪:১১৪]

ফ্রিমেসন, রসিক্রুসিয়ানের মতো গোপন সংগঠনগুলো জনগণের বিশ্বাস অর্জনের জন্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণকর কাজ করে। কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, নিজ সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং এ জন্য তারা প্রয়োজনে অন্যের অধিকার হরণ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ফ্রিমেসন সদস্য কোনো আদালতে গেলে সে বিচারককে তাদের গোপন ম্যাসন-সংকেত দেখায়। আর সেই বিচারক যদি ফ্রিমেসন হয় তাহলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ঐ লোকের পক্ষে রায় দিতে।

(৮) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৬৫, হাদীস নং ২০৯।

www.pathagar.com

এছাড়াও আমরা দেখতে পাই, রসূল ﷺ নিজেও মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে এমন গোপনীয়তাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। ইব্ন 'উমার রা.-এর বর্ণনায় তিনি বলেন, "যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে ,তবে একজনকে বাদ দিয়ে দুজন চুপিচুপি কথা বলবে না।"(৯)

খ. সৎ ব্যক্তিত্ব

মু'মিন ব্যক্তি কারও সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে না। সামনে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে পিছনে তাদের নিন্দা করা কখনো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসত, আর ওদের কাছে অন্য রূপে যেত।"(১০)

গ. সত্যের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তিত্ব

একজন মুসলিম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, মুক্তির একমাত্র পথ হলো ইসলাম। এই মহাসত্য অনুধাবন করতে পারলে সে অবশ্যই অন্যকে তা জানিয়ে দিতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। সে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবে না। একজন মুসলিমের পক্ষে অন্যকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহ ﷻ ও মুসলিমদেরকে ইসলামের সুমহান বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করেছেন।

"আপনি আপনার পালনকর্তার পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন।"(১১)

[আন-নাহ্‌ল, ১৬:১২৫]

রসূল ﷺ বলেছেন যে, দা'ওয়াতের এ দায়িত্ব কেবল আলিমদেরই নয়; বরং যার যতটুকু জ্ঞান আছে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেকের উপর নৈতিক দায়িত্ব। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ

(৯) সহীহ্ আল-বুখারি, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ২০৩, হাদীস্ নং ৩০৩।
(১০) সহীহ্ আল-বুখারি, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ৫৩, হাদীস্ নং ৮৪ এবং সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ১৩৪২, হাদীস্ নং ৬১৩৫ এবং পৃষ্ঠা ১৩৭৪ হাদীস্ নং ৬৩০০।
(১১) আন-নাহ্‌ল, ১৬:১২৫।

www.pathagar.com

বলেন, "আমার নিকট থেকে একটি আয়াত শিখলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।"(১২)

ইসলামে জ্ঞান গোপন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। দীনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা মানুষের কাছে তা গোপন করে, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে বলেন,

"আমি যে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ ﷻ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে।"(১৩)

[আল বাক্বারাহ, ২:১৫৯]

রসূল ﷺ এটাও বলেছেন, "যে 'ইল্‌ম গোপন করে তাকে জাহান্নামের জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হবে।"(১৪)

২. সলাত

ইসলামে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্দ করা হয়েছে। তবে কোনো মুসলিম চাইলে এর বেশি নফল সলাহ আদায় করতে পারবে। মানুষ মাঝেমধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ভুলে যায়। অনেক সময় সে জৈবিক চাহিদা মেটাতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, আধ্যাত্মিক চাহিদার কথা ভুলেই যায়। ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্দ সলাতের সময়কে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন একজন মুসলিম দৈনন্দিন সব কাজকর্ম আল্লাহর 'ইবাদাতকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত করে। সাধারণত মানুষ দৈনিক কাজকর্মকে বস্তুগত প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাতে চায়। যেমন, সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া, দুপুরে লাঞ্চের সময় খাওয়া, বিকালে কফির জন্য বিরতি নেওয়া, সন্ধ্যায় নাশতা খাওয়া এবং রাতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমাতে যাওয়া। কিন্তু শরীরের

(১২) সহীহ্ আল-বুখারি, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ৪৪২, হাদীস্ নং ৬৬৭।

(১৩) আল-বাক্বারাহ, ২:১৫৯।

(১৪) ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আন-নাসা'ই এবং ইব্‌ন মাজাহ কর্তৃক সংগৃহীত। সহীহ্ জামি' আস-সাগীরে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীস্ নং ৬২৮৪, ৬৫১৭।

www.pathagar.com

যেমন একটা নানা চাহিদা আছে, তেমনি আত্মারও কিছু প্রয়োজন আছে। আর সলাহ মুসলিমদের সেই আত্মিক চাহিদা পূরণ করে।

সলাহর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ﷻকে স্মরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ ﷻ, আমি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্য সলাত কায়েম করো।"

[আত তাহা, ২০:১৪]

আল্লাহ ﷻকে স্মরণ রাখা একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সাধারণত একজন মানুষ তখনই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, যখন আল্লাহর কথা তার স্মরণ থাকে না। আল্লাহর ভয় না থাকলেই শয়তানী শক্তি খুব সহজে মানুষকে প্রভাবিত করে ফেলে। আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখার জন্য শয়তান মানুষের মনকে অপ্রয়োজনীয় নানা চিন্তা এবং কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত করে রাখে। আর আল্লাহর কথা যখন ভুলে যায়, তখন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবেই খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। কুর'আনে আল্লাহ ﷻ এই সমস্যাকে চিহ্নিত করে বলেছেন:

"শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।"

[আল-মুজাদালাহ, ৫৮:১৯]

আল্লাহ ﷻ নেশাজাত দ্রব্য এবং জুয়া খেলাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ এগুলো মানুষকে আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। মানুষ সহজেই নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়ে। একবার আসক্ত হয়ে পড়লে মানুষ এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে, যা তাদেরকে বিভিন্ন অপকর্মের দিকে ঠেলে দেয়। পরিণতিতে তারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সূরা আল-মা'ইদাহতে আল্লাহ ﷻ এ সম্পর্কে বলেন,

"শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর চায় আল্লাহর স্মরণ ও সলাত থেকে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" [আল-মা'ইদাহ, ৫:৯১]

www.pathagar.com

কাজেই, মানুষের নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই আল্লাহ ﷻকে স্মরণ করা উচিত। মানুষ ঈমানী দুর্বলতার সময়েই পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যদি আল্লাহ ﷻকে স্মরণ করার কোনো উপায় না থাকত, তবে একের পর এক পাপ কাজ করতে করতে তারা পাপের মধ্যে ডুবে যেত। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করে, তারা সবসময় আল্লাহ ﷻকে স্মরণে রাখে। ফলে তারা কোনো পাপ কাজ করে ফেললেও তাওবা করে নিজেদেরকে আবার শুধরে নিতে পারে।

সলাতের ব্যাপারে গতানুগতিক মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি

এটা খুবই দুঃখজনক যে, গতানুগতিক মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে খুব হালকাভাবে গ্রহণ করে। তাদের ধারণা, সলাহ কেবল তাদের ভালো কাজের তালিকাটিকে একটু দীর্ঘ করবে। এ কারণে, কোনো কোনো মুসলিম কেবল বছরে দুই 'ঈদে দু'বার সলাহ আদায় করে। কেউ আবার কেবল রমাদানে, আর কেউ কেউ শুধু শুক্রবারে জুমু'আর সলাহ আদায় করে। অধিকাংশেরই প্রত্যহ এক বা একাধিক ওয়াক্তের সলাহ ছুটে যায়। কেউ কেউ আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ আদায় করে নেয়। আবার কিছু লোক মনে করে, একটু বুড়ো হয়ে নিই, তারপর নামাজ-কালাম পড়া যাবে। অনেকে আবার এত দ্রুত সলাহ আদায় করে যে সে কী পড়ছে তা নিজেই বোঝে না। অথচ এভাবে দ্রুত সলাহ আদায়কারীকে রসূলুল্লাহ ﷺ তা পুনরায় আদায় করতে বলেছেন। কেননা এধরনের সলাত আল্লাহর কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।[১৫]

কোনো কোনো অঞ্চলে মহিলাদের সলাহ আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অথচ রসূল ﷺ তার উম্মতকে আদেশ করেছেন ঠিক সেভাবে সলাহ আদায় করতে, যেভাবে

(১৫) সহীহ মুসলিম, কিতাবুস-সলাহ

www.pathagar.com

তিনি করেছেন। আর তাঁর থেকে নারী-পুরুষের সলাতের ভিন্ন কোনো পদ্ধতি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

এসব কারণে দেখা যায় যে, কিছু মুসলিম সলাহ আদায় করা সত্ত্বেও অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায় তারা অসৎ নীতি অবলম্বন করে। অথচ আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

"নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"(১৬)

[আল-আনকাবূত, ২৯:৪৫]

কাজেই সলাহ যদি কাউকে দুর্নীতি ও অশ্লীলতা থেকে বিরত না রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে সলাহ আদায় করছে না।

সলাহ আদায়কারীর ব্যক্তিত্ব

সলাত একজন ব্যক্তির মধ্যে নিম্নরূপ গুণাবলি গড়ে তোলে:

ক. আল্লাহভীতি

একজন আল্লাহভীরু ও সচেতন মুসলিম যেকোনো কাজের পূর্বে নিজেকে প্রশ্ন করবে, 'এই কাজটি কি আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন?' আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে সচেতনতা বা তাকওয়া হলো ন্যায়নিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি। কেননা, এই সচেতনতাই সর্বাবস্থায় একজন মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।

খ. উত্তম কথা

একজন সত্যিকার মু'মিন অশালীন ভাষা, অপবাদ, গীবত, মিথ্যাচার প্রভৃতি বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত থাকবে। মন্দ কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার সর্বোত্তম অনুশীলন হলো সলাত। কেননা সলাতের মধ্যে

(১৬) আল-আনকাবূত, ২৯:৪৫।

www.pathagar.com

একজন মুসলিম কেবল ভালো বাক্যই পাঠ করে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্যে একটি চমৎকার প্রশিক্ষণ। রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।"(১৭)

গ. উত্তম কাজ

স্বাভাবিকভাবেই সলাহ আদায় করার সময় একজন মুসলিম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। সলাতের মধ্যকার কাজগুলোকে সাজানোই হয়েছে এমনভাবে যার মাধ্যমে একজন মুসলিমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাগুলো আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়ে ওঠে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া হতে থাকে আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে; যা তাকে সলাতের বাইরেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলে সে যা করে, যা দেখে, যা শোনে, যা স্পর্শ করে এবং যেদিকে চলে তা সবই হয় কল্যাণকর। তখন মানুষের সাথে তার সম্পর্ক হয় সৌহার্দ্যপূর্ণ। রসূল ﷺ এই বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, "দীন হলো সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"

৩. যাকাত

প্রাক-ইসলামি যুগেও আরবরা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে তা ছিল নিছক লোক দেখানোর জন্য। ইসলামে দানশীলতা কেবল একটি প্রশংসনীয় গুণই নয়, বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। রসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিদের যত্ন করে।"(১৮)

উদারতা এবং পরিতুষ্টিকে সব সমাজেই অত্যন্ত মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সকলের যদি সমান সম্পদ থাকত, তবে এ দুটো

(১৭) সহীহ আল-বুখারি, হাদীস নং ৬০১৮, মুসলিম, হাদীস নং ৪৭ ।
(১৮) সহীহ আল-বুখারি ও সহীহ মুসলিম

www.pathagar.com

গুণ কখনোই বিকশিত হতো না। মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, নিজের সম্পদ অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়াটা কল্যাণকর, তাহলেই তার মধ্যে উদারতার গুণটি বিকাশ লাভ করে। তখন সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সে লড়াই শুরু করে। অপরপক্ষে, একজন মানুষের মন তখনই পরিতুষ্ট হয়, যখন সে লোভ ও হিংসা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। আত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এ সংগ্রাম যেন অব্যাহত থাকে এ লক্ষ্যে নিজ প্রজ্ঞাবলে দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ সবাইকে সবকিছু সমানভাবে দেননি। কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"আল্লাহ ﷻ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" [আন-নাহল, ১৬:৭১]

সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা থেকে জন্ম নেওয়া দুটো মারাত্মক রোগ হলো, লোভ ও কৃপণতা। আল্লাহ ﷻ মু'মিনদেরকে বলেছেন, সম্পদ মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতস্বরূপ। এ দুনিয়াতে মানুষের আগমনের আগেও সম্পদ ছিল, তাদের মৃত্যুর পরেও তা থেকে যাবে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে সম্পদ ব্যয় করা হলে তা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যই কল্যাণকর হবে। কেবল স্বার্থপরের মতো নিজ সুখের জন্য সম্পদ ব্যবহার করা হলে দুনিয়াতে তার জন্য যেমন সেটা কাল হয়ে দাঁড়াবে, আখিরাতেও তা ভয়াবহ শাস্তির কারণ হবে। আল্লাহ ﷻ মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও সন্তান কখনো কখনো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

"আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা।"

[আল-আনফাল, ৮:২৮]।

এখানে মু'মিনদের সাবধান করা হয়েছে যেন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। কেননা এগুলো মূলত মানুষের আমানতদারিত্বের পরীক্ষা। আল্লাহ ﷻ কুর'আনের অন্যত্র বলেছেন **"হে মু'মিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়।"** [আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৯]

এবং

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারেন।"

[আল-আন'আম, ৬:১৬৫]

মানুষের সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার এই জীবনে কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। 'যত পায় ততই চায়' এটাই মানুষের প্রকৃতি। রসূল ﷺ বলেছেন,

"যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের একটা উপত্যকা থাকে, তবে সে দুটি কামনা করবে। তার মুখ (কবরের) মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তাওবা করবে, আল্লাহ ﷻ তা কবুল করেন।"(১৯)

দান-সদাকা করার অভ্যাস এই ধরনের লাগামহীন লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যকর একটি উপায়। তাই আল্লাহ ﷻ নাবি ﷺকে ধনীদের সম্পদের একটি অংশ সংগ্রহ করে বিত্তহীনদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

"তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ নাও, এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো।" [আত-তাওবাহ, ৯:১০৩]

ইসলামে আবশ্যিক দান-সদাকাহ্‌র বিধানটিকে বলা হয় যাকাত(২০)। যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তাদের জন্য প্রতি বছর এই যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক। যাকাত প্রদান না করা একটি কবীরা গুনাহ। যাকাত মুসলিমদের মনে এই বোধ সৃষ্টি করে যে, সম্পদের আসল মালিক সে নয়; সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের কোনো অধিকারও তার নেই। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষণিকের জন্য দুনিয়ার এ সম্পদের মালিকানা দান করা হয়েছে। এই সম্পদে দুঃস্থ-অসহায় মানুষেরও একটা অংশ আছে। এ কারণে, আল্লাহ ﷻ তাদেরকেই সত্যিকার মু'মিন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন যারা তাদের সম্পদ থেকে গরিবদের অধিকার আদায় করে ।

"আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"

[আয-যারিয়াত, ৫১:১৯]

---

(১৯) সহীহ আল-বুখারি, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ২৯৭-৮, হাদীস নং ৪৪৭।

(২০) আক্ষরিক অর্থে যাকাত বলতে বোঝায় 'পরিশুদ্ধি' এবং 'বৃদ্ধি'।

www.pathagar.com

তবে, এই দানের উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন; মানুষকে দেখানো বা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার নয়। যদি কেউ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দান করে, তবে সে আখিরাতে কোনো পুরস্কার তো পাবেই না, বরং সে হবে শাস্তিযোগ্য। এই ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"হে মু'মিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকাগুলো ধ্বংস করে দিও না।" [আল-বাক্বারাহ, ২:২৬৪]।

মানুষের মনে লোভ থাকলে সম্পদের লালসা বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ ﷻ অন্যদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন তার প্রতি লোভ করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সেসবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।" [আন-নিসা, ৪:৩২)

এ বিষয়ে রসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমরা যদি তোমাদের উপর বর্ষিত আল্লাহর নি'আমাতসমূহকে অস্বীকার না করতে চাও, তাহলে যারা তোমার চেয়ে কম ভাগ্যবান তাদের দিকে তাকাও। যাদের অবস্থা তোমাদের চেয়ে ভালো তাদের দিকে তাকিও না।"[২১]

মানুষ যখন তার চেয়ে অধিক সম্পদশালীদের দিকে তাকায়, তখন তার মনে হিংসা জন্মাতে থাকে। মনে হয় যে, আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতি বৈষম্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত সম্পদের লোভে সে নানা ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো, তাদের উচিত ধনীদের বদলে তার চেয়ে দরিদ্রদের কথা চিন্তা করা। কেননা, কারো অবস্থা যত কঠিন বা কষ্টেরই হোক না কেন, কেউ না কেউ তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। এমনটি করা হলে তার উপর আল্লাহর অসংখ্য নি'মাতের কথা স্মরণ করে সে তাঁর অপার অনুগ্রহ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে একজন মানুষ যখন হিংসাত্মক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তখন তার মনে পরিতুষ্টির বোধ জন্ম হতে থাকে। এছাড়াও, রসূল ﷺ এর হাদীস থেকে

(২১) সহীহ বুখারি, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ৩২৮, হাদীস নং ৪৯৭ এবং সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ১৫৩০, হাদীস নং ৭০৭০।

www.pathagar.com

আমরা জানতে পারি যে, বস্তুগত সম্পদ প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবি ﷺ বলেন,

"বৈষয়িক প্রাচুর্যই ঐশ্বর্য নয়, বরং অন্তরের ঐশ্বর্যই হলো প্রকৃত ঐশ্বর্য।"(২২)

পরিতুষ্ট হওয়ার অর্থ এই নয়, মানুষ যে যে অবস্থায় আছে সেভাবেই পড়ে থাকবে, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টা করবে না। বরং এর অর্থ হলো, জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য একজন মানুষ বৈধ পন্থায় তার সাধ্যমতো চেষ্টা করার পর, আল্লাহ ﷻ তার জন্য যা বরাদ্দ রেখেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। মানুষের হৃদয় তখনই প্রশান্তি লাভ করে, যখন সে সাধ্যমতো পরিশ্রম করে এবং পাশাপাশি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। এ সম্বন্ধে কুর'আনে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" [আর-রা'দ, ১৩:২৮]

গতানুগতিক মুসলিমদের দৃষ্টিতে যাকাত

অনেক মুসলিমরাই যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারার কারণে এই আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। সকল সামর্থ্যবান মুসলিমরা যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে পৃথিবীর কোথাও মুসলিমদের কোনো অর্থনৈতিক দুরবস্থা থাকত না। তারা অনেক ভালো অবস্থানে থাকত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জাতিসংঘের রিলিফ এজেন্সিগুলো মুসলিম দেশে কাজ করছে। কিন্তু এমনটা হওয়া মোটেই উচিত ছিল না। আবার অনেকেই তাদের যাকাতের অর্থ কেবল নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে। এটা অনুমোদিত হলেও এ খাতই যে সবার আগে আসবে তা নয়। কেননা মুসলিমদের উচিত এমনিতেই সবসময় আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য সহযোগিতা করা। তবে হ্যাঁ, যদি আত্মীয়রাই সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত হয়, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। অন্যথায়, যাকাতের অর্থ সমাজের আরও বেশি অভাবী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া উচিত। আর অতিরিক্ত দান-

(২২) সহীহ আল-বুখারি, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ৩০৪, হাদীস নং ৪৫৩।

www.pathagar.com

সদাকাহ্‌র মাধ্যমে নিজেদের অভাবী আত্মীয়দের সাহায্য করা সব সময়ের জন্যই একটি নৈতিক দায়িত্ব ।

যাকাত যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

ক. উদারতা

যাকাত মু'মিনদের দানশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। যাকাত যদিও বছরে একবার আদায় করা ফরজ, কিন্তু এটা মানুষের মনে এমন এক উদারতা সৃষ্টি করে, যা তাদেরকে আরও অতিরিক্ত দান-সদাকা করতে উজ্জীবিত করে তোলে। তাই যাকাতের মূল চেতনা কেবল বছরে একবার দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সারাবছর ধরে উদারতার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

খ. করুণা ও সমবেদনা

অন্যের সেবা করা সকলের কাছেই একটি মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত। যাকাত মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে সমাজের সকলকে নিয়ে ভাবতে শেখায়। যারা অভাবী মানুষদের যাকাত দিয়ে সাহায্য করে, তাদের মনে অভাবীদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়।

৪. সওম বা রোজা

রমাদানের পুরস্কার

ক) রসূল ﷺ বলেছেন, *"রমাদান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।"*[২৩] এ মাস হলো একজন মানুষের জন্য ভালো কাজ করার মাধ্যমে জান্নাত লাভের উপযুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ।

(২৩) সহীহ আল-বুখারি, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৬৮, হাদীস নং ১২২ এবং সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৫২৪ এবং হাদীস নং ২৩৬১।

www.pathagar.com

খ) রমাদান পাপ মোচনের একটি সুযোগও বটে। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ বলেন, *"যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় বিশুদ্ধ নিয়তে সিয়াম পালন করবে, তার পেছনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"*(২৪)

গ) আন্তরিকভাবে সওম পালন করা হলে তা তাদেরকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। রসূল ﷺ বলেন, *"সিয়াম হলো ঢালস্বরূপ।"*(২৫)

ঘ) যারা উত্তমভাবে সওম পালন করে আল্লাহ ﷻ নিজে তাদেরকে বিশেষ পুরস্কার দান করবেন। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ ﷻ বলেন, *"আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম কেবল আমারই জন্য; আর আমিই এর প্রতিদান দেব।"*(২৬)।

ঙ) রমাদান মাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুর'আন নাযিলের মাস। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেন,

"রমাদান মাস, যাতে সেই কুর'আন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে।" [আল-বাকারাহ, ২:১৮৫]

অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতির উপর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হলো মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন। যদি আল্লাহ ﷻ এই অনুগ্রহ আমাদেরকে দান না করতেন, তবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের দিকনির্দেশনা যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, এতদিনে তা সম্পূর্ণই হারিয়ে যেত। গোটা দুনিয়াজুড়ে জাহিলিয়্যাত ও জুলুমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ত।

সওমের উদ্দেশ্য

সওমের মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মনে তাকওয়া বা আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সূরা বাকারাহ্‌র ১৮৩ তম আয়াতে তিনি বলেন,

(২৪) সহীহ্ আল-বুখারি, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০, হাদীস্ নং ১২৫।
(২৫) সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৫৫৪, হাদীস্ নং ২৫৬৫।
(২৬) সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৫৫৯, হাদীস্ নং ২৫৬৬।

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফার্দ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফার্দ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

তাকওয়া হলো একজন মুসলিমের জীবনে অর্জিত গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গুণ। যার অন্তরে তাকওয়া আছে, সে আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এ শব্দটির মূলের দিকে লক্ষ্য করলেও বিষয়টি বোঝা যায়। 'তাকওয়া' শব্দটি এসেছে ক্রিয়াপদ 'ওয়াকা' থেকে, যার অর্থ হলো 'রক্ষা করা'। তাকওয়া অর্জিত হয় সর্বদা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো পালন করার মাধ্যমে। এর মানে হলো হারামের সাথে সাথে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহও পরিহার করে চলা। এমনকি সন্দেহ সৃষ্টি হলে বৈধ বিষয়কেও এড়িয়ে চলা।

অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, সওম মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। উদাহরণস্বরূপ, সওম পালনের ফলে শরীরের রক্তনালী ও বিভিন্ন অংশে মেদ হিসেবে জমে থাকা কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস পায়। এভাবে সওম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

সওমের ব্যাপারে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে সওম কেবলই একটি আচার-প্রথার রূপ লাভ করেছে। রমাদানের মাস এখন আর তাই অধিক 'ইবাদাত কিংবা সংযমের নয়, বরং তা যেন একটি উদ্‌যাপনের মাস। এমনকি, কিছু কিছু দেশে তো রমাদানের রাতগুলো যেন পার্টি ও উপভোগের রাতে পরিণত হয়েছে। সেখানে রাতই যেন দিন, আর দিন যেন রাত। হালকা খাবার খেয়ে সাহরি করার নির্দেশ দেওয়া হলেও মানুষ সেটাকে তিন বেলা ভরপেট খাবারের মতো করে নিয়েছে। এ কারণে খুব অল্প মানুষই সত্যিকারের ক্ষুধার জ্বালার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আর ইফতারির সময় হরেক পদের মুখরোচক খাবার দিয়ে যেন আরও

www.pathagar.com

তিনবেলার খাবার গেলার প্রতিযোগিতা চলে। এ মাসে তাই অনেকেরই শরীরের ওজন আরও বেড়ে যায়।

সওম পালনকারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য

ক. সংযম

সওম মানে খাদ্য, পানীয় এবং দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকা। সওম মুসলিমদেরকে আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়। এভাবে ইফতারির সময় সামনে খাবার রেখে না খাওয়ার মাধ্যমেও সওম পালনকারীকে তাকওয়ার সত্যিকার পরীক্ষা দিতে হয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার দেখলে সকলের মধ্যেই পেটপুরে খাওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। এক্ষেত্রে একজন মু'মিনের করণীয় হচ্ছে ক্ষুধা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংযম পালন করা এবং সূর্যাস্তের পর হালকা খাবার দিয়ে ইফতারি করা। রসূল ﷺ এর অভ্যাস ছিল, তিনটি খেজুর ও পানি দিয়ে সওম ভাঙা; তারপর মাগরিবের সলাহ আদায় করে মধ্যম মানের খাবার গ্রহণ করা।

সওম শুধু শারীরিক সংযম নয়, বরং আত্মিক সংযমও শিক্ষা দেয়। সওম পালনকারী ব্যক্তি কেবল খাদ্য, পানীয় আর যৌনসঙ্গম থেকেই নিজেকে বিরত রাখে না; বরং সকল প্রকার মিথ্যাচার, পরনিন্দা, অপবাদ ও খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে। রসূল ﷺ বলেছেন,

> *"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ বর্জন করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"*[২৭]

তিনি আরও বলেন,

(২৭) আবু হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারি কর্তৃক সংগৃহীত আরবি-ইংরেজি, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৭১-৭১, হাদীস নং ১২৭ এবং আবু দাউদ ইংলিশ ট্রান্সলেশন, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীস নং ২৩৫৫।

www.pathagar.com

"তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোজাদার'।"(২৮)

কাজেই কেউ সত্যিকার সংযমের সাথে সওম পালন করলে, সওম তার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাবে, তাকে সত্যবাদী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তার কথা ও কাজের ব্যাপারে তাকে অধিক সতর্ক করে তুলবে।

খ. পরিমিতিবোধ

সিয়ামরত অবস্থায় একজন মুসলিমের নিজেকে অনেক কিছু থেকে সংযত রাখতে হয়। এটা তাদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটা পরিমিতিবোধের জন্ম দেয়। এটা শুধু রমাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রসূল ﷺ তাঁর উম্মাহকে সব সময়ই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পরিমিত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। ইব্ন 'উমার, আবু হুরাইরাহ এবং আবু মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন,

"কাফির সাত পেট খায়(২৯) *আর মু'মিন খায় এক পেট।"*(৩০)

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেন,

"একজনের খাদ্য দুজনের জন্য যথেষ্ট এবং দুজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট।"(৩১)

ইব্ন 'উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ বলেছেন,

"(এক সাথে অনেকে খেলে) কেউ যেন তার সঙ্গীর অনুমতি ছাড়া একটির বেশি দুটি খেজুর একসাথে না খায়।(৩২)

---

(২৮) আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত এবং আল-বুখারি কর্তৃক সংগৃহীত আরবি-ইংরেজি, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৭১, হাদীস নং ১২৮, মুসলিম ইংলিশ ট্রান্সলেশন, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৫৫৮ এবং, হাদীস ২৫৬৩ এবং আবু দাউদ ইংলিশ ট্রান্সলেশন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮, হাদীস নং ২৩৫৬)।

(২৯) এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হলো মি'আন যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'অন্ত্র'।

(৩০) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ১১৩৭, হাদীস নং ৫১১৩।

(৩১) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ১১৩৬, হাদীস নং ৫১১১।

(৩২) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ১১২৮, হাদীস নং ৫০৭৭।

www.pathagar.com

গ. সহানুভূতিশীলতা

সিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে পারে। যার কারণে সে অনাহারীদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তখন তার মধ্যে অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোর একটি মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এর উত্তম দৃষ্টান্ত হলো 'ঈদ আল-ফিতর। এ দিন সকল মুসলিম একসাথে সওম ভাঙ্গে এবং অভাবীদেরকে অন্ন দেওয়ার মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করে।

৫. হাজ্জ

মানুষ সাধারণত দুটি উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়

১. জীবিকা অর্জন

২. বিনোদন

এ উভয় ভ্রমণেরই সম্পর্ক হলো তাদের বৈষয়িক কিংবা আত্মিক চাহিদা পূরণের সাথে। নিজ প্রয়োজনে তারা ঘর থেকে বের হয়, আর নিজ প্রয়োজন মেটাতেই অর্থ ব্যয় করে। এ ধরনের ভ্রমণে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কোনো বিষয় নেই। কারণ এক্ষেত্রে বৈষয়িক লাভের আশায় মানুষ ভ্রমণে তার সম্পদ এবং সময় ব্যয় করে। কিন্তু হাজ্জ এমন অন্য সকল প্রকার ভ্রমণ থেকে ভিন্নতর। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কোনো পার্থিব লাভ কিংবা কেবল কোনো মনবাসনা পূরণ নয়। হাজ্জ শুধু আল্লাহর জন্যই করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য কেবলই আল্লাহর একটি আদেশ পালন। শুধুমাত্র তারাই এ হাজ্জযাত্রায় অংশ নিতে পারে, যারা আল্লাহকে সত্যিই ভালোবাসে এবং তাঁকে ভয় করে। আর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এতে শামিল হওয়া তার জন্য একটি আবশ্যিক 'ইবাদাত। যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে অর্থ ব্যয় করে হাজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং বিভিন্ন কষ্টকর পরিস্থিতি হাসিমুখে মেনে নেয়, এটা তার তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই নিদর্শন। এর দ্বারা সে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতে,

www.pathagar.com

সকল কষ্ট সহ্য করতে, স্বেচ্ছায় নিজের সম্পদ ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত আছে।

ইসলামে বাহ্যিক 'ইবাদাতগুলো মূলত দু'ধরনের: শারীরিক 'ইবাদাত, যেমন সলাহ ও সওম; অথবা আর্থিক 'ইবাদাত, যেমন যাকাত ও অন্যান্য দান। কিন্তু হাজ্জ এমন একটি 'ইবাদাত যেখানে শারীরিক-আর্থিক উভয় ধরনের কাজই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এটি ইখলাস, দীনদারী, আনুগত্য, ত্যাগ এবং আত্মসমর্পণের মতো 'ইবাদাতের বিভিন্ন আত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। হাজ্জের যে সকল কাজ করতে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে রয়েছে তাওয়াফ করা, সাফা এবং মারওয়াহ পাহাড়ের মাঝে সা'ই করা এবং মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান করা। সলাহ ও সওমের চেয়ে এ কাজগুলো করা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। মূলত সলাহ ও সওমের সাথে সংযম, নম্রতা ও আনুগত্যের যে বিষয়গুলো সম্পৃক্ত সেগুলোর প্রত্যেকটি হাজ্জের মধ্যেও পাওয়া যায়। দান-খয়রাত এবং যাকাত মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি দেয়, মনকে উদার করে এবং নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার একটি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। যাকাত ও হাজ্জের আত্মিক উদ্দেশ্য অনেকটা একই রকম। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাজি তার সম্পদ থেকে খরচ করে এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পশু কুরবানী করে।

অন্য সময় সম্ভব না হলেও হাজ্জের সময় মানুষ মাসজিদুল হারামে সলাহ আদায় করারও সুযোগ পায়। এর দ্বারা সে অসামান্য পুরস্কার ও বিশেষ রহমাত লাভ করে ধন্য হয়। মাসজিদুল হারাম হচ্ছে সেই মাসজিদ, যার দিকে মুখ করে গোটা পৃথিবীর মুসলিম জাতি সারা বছর সলাহ আদায় করে। বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে এই মাসজিদে আদায়কৃত সলাহ অনেক বেশি বরকতময়। রসূল ﷺ বলেছেন,

> *"মাসজিদুল হারামের এক রাকা'আত সলাহ, অন্য কোনো স্থানে এক লক্ষ রাকা'আত সলাহ আদায়ের সমান।*(৩৩)

(৩৩) ৫২ মিশকাত আল-মাসাবীহ, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ১৪০।

www.pathagar.com

এছাড়াও, হাজ্জের আরও বড় বড় কিছু ফযিলত আছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হলো: পাপমোচন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। পাপমোচনের বিষয়টিকে রসূল ﷺ উপমা দিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যপ্রসূত নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।"(৩৪)

অন্যদিকে জান্নাত লাভের ব্যাপারে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন,

"আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূর বা কবুল হাজ্জের প্রতিদান।"(৩৫)

মনে হতে পারে যে, হাজ্জের এই সুফল লাভ করা খুবই সহজ। কিন্তু আসলে তা নয়। কেবল হাজ্জের কিছু বাঁধাধরা আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেই এসব কল্যাণ লাভ করা যাবে না। আল্লাহর কাছে হাজ্জ গ্রহণযোগ্য হতে হলে প্রয়োজন, বাস্তব জীবনে দীনের উপর অবিচল থাকার প্রবল আগ্রহ। আর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকলেই কেবল কারও মনে এমন আগ্রহ জন্ম নিতে পারে। এই ইখলাস বা আন্তরিকতাই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে হাজ্জ পালনকারীকে আত্মিক পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। ফলে হাজি নেতিবাচক কাজ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়।

হাজ্জ হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্মিলন। সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে খুব সামান্য সময়ই পাওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের আচার-অভ্যাসের ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কিছু না কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কিছু খারাপ মানুষও রয়েছে যারা অসৎ উদ্দেশ্যে হাজ্জে আগমন করে। তাই মনে কষ্ট, শরীরে ব্যথা পাওয়া কিংবা পকেটমারের শিকার হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু আগুন যেমন সোনাকে পুড়িয়ে খাঁটি করে, তেমনি হাজ্জের সময়ের কষ্ট ও ত্যাগ-

(৩৪) ৫৩ সহীহ মুসলিমে সংগৃহীত, সহীহ আল-বুখারি, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৮, হাদীস নং ৫৯৬, মিশকাত আল-মাসাবীহ, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৫৩ এবং রিয়াদুস-সালিহীন, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৬১৫, হাদীস নং ১২৭৪।

(৩৫) ৫৪ মিশকাত আল-মাসাবীহ, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৫৩৫, রিয়াদুস-সালিহীন, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৬১৫, হাদীস নং ১২৭৫, মুয়াত্ত ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা ১৫৮, হাদীস নং ৭৫৬ এবং সহীহ আল-বুখারি, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ০১, হাদীস নং ০১।

www.pathagar.com

তিতিক্ষাও মানুষকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে। চাইলেই কারও পক্ষে সব রকম ঝক্কি-ঝামেলা ও মানুষের ভীড় এড়িয়ে নির্ভুল হাজ্জ পালন সম্ভব নয়। কেননা হাজ্জ হচ্ছে মানুষের মাঝে থেকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। রসূল ﷺ নির্জনবাস নয়, বরং সামাজিকভাবে বসবাসের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

> *"যে মু'মিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং ধৈর্যের সাথে তাদের অসৌজন্যমূলক কাজকর্ম এবং খারাপ আচরণকে সহ্য করে নেয়, সে সেই ব্যক্তির থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশাও করে না কিংবা তাদের বিরক্তিকে ধৈর্যের সাথে মেনে নেয় না।"*(৩৬)

আল্লাহর কাছে কবুল হাজ্জ নিশ্চয়ই বরকতময় এবং হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তির উপরও তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। হাজ্জের মাধ্যমে তার মধ্যে আত্মিক যে জাগরণ সৃষ্টি হয়, তা তাকে তার গোটা জীবনকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করে। হাজ্জ মাবরূর বা নির্ভুল হাজ্জ মানুষের মনে আল্লাহভীতি সঞ্চার করে, যা জীবনধারাকে সংশোধন করে দেয়। সে নিজে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আত্মিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে অন্যদেরকে সে ইসলামি জীবনবিধান বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান জানায়। হাজ্জ পালনকারীর মধ্যে যদি এধরনের পরিবর্তন না দেখা যায় এবং সে তার হাজ্জপূর্ব অনৈসলামিক জীবনধারায় ফিরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার হাজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হয়নি। এই হাজ্জ কেবল তাকে একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু যে মহান উদ্দেশ্যে হাজ্জের বিধান দেওয়া হয়েছিলো, সেই উদ্দেশ্য সাধনে সে সম্পূর্ণই ব্যর্থ।

বর্তমান মুসলিমদের দৃষ্টিতে হাজ্জ

সক্ষমতা থাকলে একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তার হাজ্জ পালন ফার্দ হয়ে যায়। অথচ অজ্ঞতার কারণে বিলম্বে হাজ্জ করাকে শ্রেয় মনে করা

(৩৬) মিশকাত আল-মাসাবীহ, খণ্ড ২, বুক ২৪, সাধারণ আচার-ব্যবহার অধ্যায় দুই, পৃষ্ঠা ১০৫৫, সহীহ ইবন মাজাহ, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৩৭৩, হাদীস নং ৩২৫৭।

www.pathagar.com

হয়ে থাকে। এটা মোটেই ঠিক নয়। এই ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছে রসূল ﷺ এর একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা থেকে। হাদীসটি হলো,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ এর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে সদ্যপ্রসূত নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।"(৩৭)

অজ্ঞ লোকেরা এ হাদীসের ভিত্তিতে যুক্তি দেখায় যে, শেষ বয়সে হাজ্জ করাই ভালো। এতে তার পূর্বেকার জীবনের সব পাপ মুছে যাবে এবং বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন পাপও আর তেমন করা হবে না। অথচ ফার্দ হওয়ার পর ইচ্ছাকৃত হাজ্জ পালনে দেরি করাই একটি ভয়াবহ পাপ। আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃত সারাটা জীবন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তাহলে তার হাজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। বিলম্বে করা এসব লোকদের হাজ্জ নিছক কিছু বাহ্যিক কাজের সমষ্টি, এতে আন্তরিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা খুবই অল্প। এ ধরনের লোকেরা হাজ্জ থেকে ফিরে এসে জুব্বা পড়ে আর মাথায় হাজি রুমাল দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আসলে তারা মানুষকে দেখায় যে, তারা হাজ্জ করে এসেছে। তারা গর্বের সাথে নিজেদের নামের সাথে 'হাজি' বা 'আল-হাজ্জ উপাধি যোগ করে। কিন্তু বাস্তবে, তাদের অন্তরাত্মার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, তার হাজ্জ আল্লাহ ﷻ কবুল করেননি। আর এক শ্রেণির বিত্তশালীদের কারও কারও জন্যে হাজ্জ তো হলো বছরে একবার দর্শনীয় স্থান থেকে একটা ট্যুর দিয়ে আসা। তাদের জন্য 'এক্সপ্রেস' হাজ্জের ব্যবস্থা থাকে, যেন হাজ্জের আচার-অনুষ্ঠানের ঝামেলায় তাদের জড়াতে না হয়।

মানুষের উপর হাজ্জের কাঙ্ক্ষিত প্রভাব

ক. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

হাজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখন প্রায় তিন মিলিয়নেরও বেশি মুসলিমরা এক স্থানে সমবেত হয়। সবাই একই রকম কাপড় পরিধান

(৩৭) রদ্দু আল-মুখতার, পরিচ্ছেদ: মাতলাবু ফি তাকফীর আল-হাজ্জ আল-কাবা'ইর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫৮।

www.pathagar.com

করে। এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের গোত্র-বর্ণ, দেশ-অঞ্চল, বিত্ত-বৈভব কোনো মুখ্য বিষয় নয়। পৃথিবীর সকল মানুষ একই জাতি। এই জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক আল্লাহ ﷻ। তিনি সকলের জন্য একটি জীবনব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশ ও জাতীয়তার ভিন্নতা, আলাদা আলাদা পতাকা কিংবা জাতীয় সঙ্গীত কখনোই মুসলিমদের কাছে ইসলামি জাতীয়তার ঊর্ধ্বে নয়। গোটা মুসলিম জাতি হলো এক উম্মাহ। জাতীয়তাবাদের অন্ধ আবেগে মানুষ ক্রিকেট খেলায় ভারত পাকিস্তানকে নিয়ে কিংবা ফুটবল খেলায় মিশর বা সৌদি আরব নিয়ে মেতে থাকে। কিন্তু হাজ্জের 'এক উম্মাহ'র ধারণা এসব জাহেলি অন্ধ আবেগের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। নিজের জন্মস্থান কিংবা নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করা মানুষের একটা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এটা কোনো দোষ নয়। কিন্তু তা যেন কখনোই অন্ধ গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের ('আসাবিয়্যাহ) সৃষ্টি না করে, যেখানে মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার না করে তার পরিবার, গোত্র বা জাতির পক্ষাবলম্বন করে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি অন্ধ (জাহিলি) পতাকার জন্য নিহত হলো, আসাবিয়্যাহ্‌র দিকে আহ্বান করল অথবা জাহিলিয়্যাতকে সাহায্য করল—সে জাহেলি অবস্থায় নিহত হলো।"[৩৮]

খ. ধৈর্য ও সহনশীলতা

কোনো একটি স্থানে একই ধর্মীয় আচার পালনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটলে সেখানে কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার। ঠেলাঠেলির মধ্যে কেউ পা মাড়িয়ে চলে যেতে পারে, কারও কনুইর গুঁতো খেতে হতে পারে। এমন অবস্থায় মেজাজ চড়ে যাওয়া বা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ফেলা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যেন আল্লাহর কাছে তার হাজ্জ কবুল হয় এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করতে পারে।

(৩৮) ৫৭ সহীহ মুসলিম, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ১০৩০, হাদীস নং ৪৫৬১।

www.pathagar.com

অধ্যায় পাঁচ

ঈমানের স্তম্ভসমূহ

ইসলামের উপর বিশ্বাস ছয়টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এগুলোকে বলা হয় আরকানুল ঈমান বা ঈমানের স্তম্ভ।

১. আল্লাহর উপর বিশ্বাস

আল্লাহর উপরে বিশ্বাস যে সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তার মধ্যে রয়েছে:

ক. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস অযৌক্তিক কোনো ধারণা নয়। এ ধরনের তত্ত্ব কেবল নাস্তিকরাই মানুষকে গেলাতে চায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, স্রষ্টা অবশ্যই অস্তিত্বমান। প্লেটো বলেছিলেন, যে কোনো ডিজাইন প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই তার একজন ডিজাইনার রয়েছে। বিশ্বজগতের এই অনুপম বিন্যাস ও নির্মাণশৈলী একজন সুনিপুণ নির্মাতার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। সাগরের বেলাভূমিতে কারও পায়ের ছাপ দেখে আমরা সাথে সাথে বলে দিতে পারি যে, কিছুক্ষণ আগেই কেউ একজন এই পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে এমনিতেই মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে গিয়েছে—এমন কোনো অলীক ধারণা কখনোই আমাদের মাথায় আসে না।

তাই অনুল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মানবজাতির ইতিহাসজুড়ে সকল সমাজই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে। কেবল এই বিংশ শতাব্দীতে এসে এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে গোটা একটা সমাজ

www.pathagar.com

স্রষ্টায় অবিশ্বাসী। রাশিয়া, চীন এবং এদের আয়ত্তাধীন দেশসমূহে অত্যন্ত সুকৌশলে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নাস্তিকতার বীজ বপন করা হয়। তারপরও, রাশিয়ায় সোভিয়েত ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং চীনে কমিউনিস্ট অর্থনীতির পতনের পর উভয় দেশেই ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার পুনরুত্থান অত্যন্ত লক্ষণীয়।

কিছু নৃতাত্ত্বিক এবং মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের বানিয়ে নেওয়া কিংবা কেবল পরস্পর থেকে শুনে শুনে লালন করা একটি বিশ্বাস। এমন ধারণা আসলে ডারউইনবাদের কুফল। এ দর্শনে মানুষকে নিছক একটু উন্নত জাতের পশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই তারা মনে করে যে, বানরদের মধ্যে যেহেতু কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, সেহেতু এটা নিশ্চয়ই মানুষের বানানো একটি বিষয়; বিবর্তনের কালক্রমে এ ধর্ম তাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। ফ্রয়েডের মতে মস্তিষ্কের Oedipal-complex হলো মানুষের স্রষ্টায় বিশ্বাসের ভিত্তি। আবার এদিকে আধুনিক কালের বেশ কিছু গবেষকের সিদ্ধান্ত হলো, স্রষ্টায় বিশ্বাস লালিত নয় বরং সহজাত; অন্যথায় এটা মানবসমাজে এতটা ব্যাপকতা লাভ করতে পারত না।

যেমন ১৯৯৭ সালে পরিচালিত একটি পরীক্ষার ফল[৩৯] নির্দেশ করে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের একটি সহজাত, সাধারণ এবং স্বাভাবিক বিশ্বাস।

তাই সঙ্গত কারণেই, কুর'আনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তবে এমন আয়াতের সংখ্যা খুব অল্প যেগুলোতে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? আসলে তাদের বিশ্বাসের কোনো দৃঢ়তা নেই।"

[আত্-তূর, ৫২:৩৫-৩৬]

যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকেই আল্লাহর অস্তিত্ব এক অনস্বীকার্য সত্য। মানবজাতির অস্তিত্ব লাভের প্রশ্নে আল্লাহ ﷻ আয়াতে তিনটি যৌক্তিক সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন:

---

(৩৯) ১ দ্য সানডে টাইমস, ২ নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১-৯।

www.pathagar.com

১. মানুষকে কেউ সৃষ্টি করেনি, বা কোনো কিছু থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি:

এই প্রস্তাবনা মৌলিক যুক্তিবোধের বিরোধী। কেননা, অনস্তিত্ব থেকে কোনো সৃষ্টি অস্তিত্বে আসতে পারে না, কিংবা শূন্যতা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

২. মানুষ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে:

এটিও অযৌক্তিক এবং একটি স্ববিরোধী প্রস্তাব। কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে, তাকে নিজেকে আগে অস্তিত্বশীল হতে হবে। সৃষ্ট কিছু হওয়ার জন্য পূর্ব থেকে অস্তিত্ব থাকাটা জরুরি নয়।

৩. মানুষকে এমন কেউ সৃষ্টি করেছে যাকে মানুষের আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অতীতের দিকে এমন এক অসীম ধারা সৃষ্টি হয়, যার কোনো শেষ নেই। আর এমনটা হলে মানুষের কোনো অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, C2, C1 কে সৃষ্টি করেছে, C2 এর পেছনে আছে C3 এবং এভাবে C3 এর পেছনে যেতে যেতে পাওয়া গেল Cn এবং এভাবে আরও যতই পেছনে যাওয়া হোক না কেন, এর কোনো শেষ নেই। এখন আমরা দেখি, C1 এর কোনো অস্তিত্ব নেই, যদি না C2 এর অস্তিত্ব থাকে এবং এভাবে অসীম ধারায় চলতে থাকবে। আর Cn এর যদি কোনো শুরুই না থাকে, তাহলে C2 অস্তিত্বে আসতে পারবে না, আর তাহলে ফলাফলস্বরূপ, C1 কখনই অস্তিত্ব লাভ করবে না। অসীম সংখ্যক ঘটনা ঘটতে অসীম সময় লাগবে, আর অসীম সময় লাগার অর্থ হলো সে ঘটনাটি কখনোই ঘটবে না। কারণ বাস্তবে সবকিছুই সীমাবদ্ধ, অসীমে কখনো পৌঁছানো সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে, দুটো সমান্তরাল রেখার মিলন হয় অসীমে, অর্থাৎ, বাস্তবে এদের কোনো মিলন হয় না। তেমনি মানবসৃষ্টির পেছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে যদি 'তাকে কে' 'তাকে কে' 'তাকে কে' এভাবে অসীম পেছনের দিকে ছোটা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্বই অসম্ভব। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল এমন যুক্তির ভিত্তিতেই প্রমাণ করেছিলেন, 'কারণ ও পরিণতি' বা 'cause and effect' -এর অসীম ধারার উপস্থিতি অসম্ভব।

www.pathagar.com

কাজেই, শেষ ও একমাত্র যে সম্ভাবনা থেকে যায় তা হলো, মানুষ এবং অন্য সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন এমন এক সত্তা যাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, বরং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, অনাদি ও অনন্ত।

২. আল্লাহ ﷻকে স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করা

আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এই দুনিয়াতে কোনো কিছুই হয় না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কল্যাণ লাভ কিংবা অকল্যাণ থেকে সুরক্ষা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে(১)। আল্লাহ ﷻ তাঁর নিজ সত্তার উপর কোনো মন্দ বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন না। কেননা তিনি ভালো এবং তাঁর কাছ থেকে যা কিছু আসে তার সবটাই ভালো। তাঁর পক্ষ থেকে আসা অনিষ্ট বা মন্দ সম্পূর্ণই একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তা মন্দ মনে হলেও, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা কল্যাণকর। উদাহরণস্বরূপ, চারাগাছ বেড়ে ওঠার জন্য এবং সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক অপরিহার্য; কিন্তু এর ফলে নদী ও খাল-বিল শুকিয়ে যায় যা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, বিশ্বপ্রকৃতির বেঁচে থাকার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন; কিন্তু এই বৃষ্টিই আবার বন্যা, প্লাবন এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে, যে মন্দ অবিমিশ্র বা পরমভাবে মন্দ, তা মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল। মানুষ মন্দ কর্মের জন্য সংকল্প করে বিধায়ই আল্লাহ ﷻ তাদেরকে তা করতে দেন এবং তারা তাতে লিপ্ত হয়। অপরদিকে, আল্লাহ ﷻ কারো উপর জুলুম বা নিপীড়ন করেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করেন না।" [আল-কাহ্‌ফ, ১৮:৪৯]

মানুষের হাতে যে অনিষ্ট হয় তা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছার অধীনেই তা ঘটে। কিন্তু মানুষ তার নিজের খারাপ কাজের জন্য দায়ী। কেননা সে নিজে এই কাজটি করতে ইচ্ছে করেছে।

---

(১) ২ আল-ফালাক্. ১১৩:১-২।

www.pathagar.com

মানুষের কোনো কাজের ইচ্ছেতে আল্লাহর অনুমোদন দানের ব্যাপারে পূর্বেকার মুসলিম 'আলিমগণ আল্লাহর 'পছন্দ'(wish) এবং আল্লাহর 'ইচ্ছা'(will)- এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি যেটা চান, সেটা হলো তাঁর 'পছন্দ'। যেমন তিনি মানুষের জন্য ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করেছেন। এটি হলো একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানেই হলো আল্লাহর যেকোনো আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়া। তবে তিনি মানুষকে স্বাধীনতাও দিয়েছেন; সে চাইলে আল্লাহর পছন্দের বাইরেও যেতে পারে।

অপরদিকে, তাঁর ইচ্ছা বলতে বোঝানো হয় তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা (Creational will)। এর মানে হলো, যা কিছুই ঘটে তা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটে। এগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে যেগুলো গ্রহণ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন, আর কিছু আছে যেখানে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না। যেমন, আল্লাহর দেওয়া 'প্রাকৃতিক আইন'। মানুষ সর্বাবস্থায় এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। কেউ যদি ওপরের দিকে লাফ দেয়, তাহলে অবশ্যই সে নিচে পড়ে যাবে। কারো গায়ে যদি কেউ আঘাত করে বা লাথি মারে, তবে সে যত শক্ত মনেরই হোক না কেন, সে সামান্য হলেও তাতে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। মানুষ কখনোই আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

কোনো নাস্তিকের কাছে যদি তার কোনো সফলতার রহস্য জানতে চাওয়া হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় যে, তার মতো সমান পরিশ্রম করেও আরেকজন কেন তার মতো সফলতা পেল না; তখন সে বলে যে, এটা ভাগ্যের খেলা। এদের মতে, মানুষের জীবন নিয়ে বিশ্লেষণে বসলে উপসংহারটা হয় এমন যে, ভাগ্যের ভালো-মন্দই গোটা জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জীবনটা তাই তাদের কাছে হয়ে যায় ভাগ্যদেবীর খেলা। গ্রিক ধর্মের সে দেবীর নাম Tyche আর রোমানদের ধর্মে তার নাম Fortuna । সে ধর্মের আচার-প্রথার মধ্যে আছে, কাঠের গায়ে টোকা দেওয়া, আঙ্গুল দিয়ে ক্রসচিহ্ন বানানো, চার পাতার গাছ, খরগোশের পা এবং ঘোড়ার জুতো পরিধান করা। দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে যেসব জিনিস এড়িয়ে চলতে হবে তার মধ্যে রয়েছে, কালো বিড়াল, ভাঙা আয়না, মাটিতে ছড়িয়ে পড়া লবণ এবং ১৩ সংখ্যা ইত্যাদি

www.pathagar.com

আরও কতো কিছু। ভাগ্যের দেবী পশ্চিমা নাস্তিকতার কাছে বেশি প্রিয়। কেননা, এটি এমন এক অন্ধ শক্তি যা তাদের উপর কোনো বিধি-নিয়ম বা কোনো দায়দায়িত্ব আরোপ করে না।

'সৌভাগ্য' বা 'পয়মন্ত' ধারণাটি পশ্চিমাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এর মতো প্রথম সারির শিল্পপতিকে দেখা গেছে চীনের ফেং শুই বিশেষজ্ঞদের কাছে ছুটে যেতে, তার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য। অ্যাপোলো ১৩ মহাকাশযান দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর এর কমান্ডারকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো যে, এর কারিগরি ত্রুটির ব্যাপারে তিনি কিছু আশংকা করেছিলেন কি না; তখন তিনি জবাব দেন, 'এমন কোনো দুর্ঘটনা যে হবে তা আগেই আঁচ করা উচিত ছিল। কেননা অ্যাপোলোর ক্রমিক নং ছিল ১৩, এটি উড্ডয়ন করেছে ১৩:০০ ঘন্টা অর্থাৎ বেলা ১টায় এবং সেটি ছিল শুক্রবারে ১৩ তারিখে।'

এছাড়াও, পশ্চিমা দেশে বেশিরভাগ বহুতল ভবনগুলোতে ১৩তম ফ্লোর বলে কিছু নেই; কোন বাসাকেও ১৩ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় না। বরং, ১৩ নাম্বার ফ্লোরকে ১৪ এবং ১৩ নাম্বার বাসাকে ১২½ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আল্লাহর প্রতি সঠিক বিশ্বাসের দাবি হলো, মুসলিমদের হৃদয় এ ধরনের কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে।

৩. একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত করা

'ইবাদাহ মানে কেবল মৌখিক প্রশংসা জ্ঞাপন, শুধু আনুষ্ঠানিক সম্মান কিংবা নিছক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করা নয়। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করাটাই হলো 'ইবাদাতের মূল কথা। সাহায্য প্রার্থনা করাও 'ইবাদাহর একটি অংশ। তাই আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে সাহায্যের জন্য ডাকার মানে হলো তার 'ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। নু'মান ইব্ন বাশীর ﷺ বলেন, রসূল ﷺ বলেন, "কারো কাছে দু'আ করা মানে হলো তার 'ইবাদাত করা[২]। যদি কেউ বিশ্বাস করে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত এ বিশ্বজগতে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না, তবে আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো নিতান্তই অর্থহীন।

(২) সুনান আবু দাউদ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৩৮৭, হাদীস নং ১৪৭৪ এবং বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত।

www.pathagar.com

স্রষ্টায় বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

ক. স্রষ্টার ব্যাপারে সদাসচেতন ব্যক্তিত্ব

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করে। আর ঈমানের প্রথম স্তম্ভটি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এমন একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে দেয়, যা কাঙ্ক্ষিত তাক্‌ওয়া অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে সচেতন সে জানে যে, এই জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। তা নিছক খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, যৌনতা ইত্যাদি পশুপ্রবৃত্তিকে ছাড়িয়ে আরও ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর।

খ. সুস্থ মানসিকতা

যখন কেউ বুঝতে পারে, তার চারপাশে যা-কিছুই হচ্ছে, তা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনেই হচ্ছে, তখন সে তার অন্তরে একটি প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা অনুভব করে। সে বুঝতে পারে, তার জীবনে ঘটে যাওয়া নেতিবাচক ঘটনাবলি তার পরীক্ষার একটি অংশ মাত্র। সে জানে জীবনে হয়তো আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য, যদি সে ধৈর্যশীল হয়।

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস বলতে বোঝায় তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাদের নাম, গুণ এবং ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল ﷺ যা-কিছু জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করে নেওয়া। ইসলামি বিশ্বাস মতে, আল্লাহ ﷻ বুদ্ধিসম্পন্ন তিনটি ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করেছেন: মানুষ, ফেরেশতা এবং জিন। এই তিনটি জাতিকে বলা হয় *জুল 'উকূল* বা বোধসম্পন্ন প্রাণী(৩)। যদিও মানুষের দেহ দৃশ্যমান বস্তুগত জগতে বাস করে, কিন্তু তাদের আত্মার

(৩) টি.পি, হিউগহেস, ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪০।

www.pathagar.com

বিচরণ আধ্যাত্মিক জগতে; যেখানে এদের কেউই দৃশ্যমান নয়। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এই জগৎ মানবাত্মা, ফেরেশতা এবং জিনদের নিয়ে গঠিত।

ফেরেশতা বা মালা'ইকাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ 'আ'ইশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেন,

"ফেরেশতাদেরকে নূর এবং জিনদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর আদাম ﷺ-কে যা থেকে সৃষ্টি তা তো তোমাদেরকে আগেই বলা হয়েছে।"[৪]

তারা আলো থেকে সৃষ্টি হলেও এটা বলা ঠিক নয় যে, তারা আলোর রূপ ধরে আবির্ভূত হয়। কেননা কুর'আন বা সহীহ্ হাদীসে এমন কোনো বর্ণনা নেই। সাধারণ মানুষ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায় না। সহাবারা রসূল ﷺ এর কাছে থাকাকালীন ফেরেশতা জিবরীল আগমন করলেও তারা তাকে দেখতে পেতেন না। 'আ'ইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন,

"হে 'আ'ইশাহ, জিবরীল এখানেই আছেন, তিনি তোমাকে সালাম দিয়েছেন। আমি উত্তরে বললাম, ওয়া 'আলাইহিস-সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি যা দেখতে পারেন আমি তা পারি না।"[৫]

কিন্তু কিছু প্রাণী ফেরেশতাদের দেখতে পায়। যেমন আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন,

"মোরগের ডাক শুনলে তোমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে তখন কোনো ফেরেশতাকে দেখেছে।"[৬]

---

(৪) সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৫৪০, হাদীস্ নং ৭১৩৪।

(৫) সহীহ্ আল-বুখারি, ভলিউম ০৫, পৃষ্ঠা ৭৫, হাদীস্ নং ১১২ এবং সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৩০২, হাদীস্ নং ৫৯৯৭।

(৬) আবু দাউদ, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১৪১৫, হাদীস্ নং ৫০৮৩), আল-বুখারি এবং সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪২৮, হাদীস্ নং ৬৫৮১।

www.pathagar.com

গ্রিক-রোমান উপাখ্যান[৭] বা খ্রিস্টানদের শিল্পকর্মে ফেরেশতাদের যেমন ডানাযুক্ত মানবাকৃতিতে দেখানো হয়, আসলে তারা মোটেই তেমন নন[৮]। বরং তারা আকারে সাধারণত বিশাল এবং তাদের ডানার সংখ্যা দুই থেকে শুরু করে কয়েকশ পর্যন্ত হতে পারে। এই সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"[৯] [ফাতির, ৩৫:১]

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত,

"রসূল ﷺ যখন ফেরেশতা জিবরীলকে তাঁর আসল রূপে দেখেন তখন তাঁর ৬০০টি ডানা ছিল এবং এর প্রতিটি ডানা গোটা দিগন্তকে ঢেকে দিয়েছিল। আর সে ডানাগুলো থেকে যেন নানা রঙের মনিমুক্তো ঝরে পড়ছিল।"[১০]

অন্য একটি বর্ণনায় রসূল ﷺ ফেরেশতা জিবরীল সম্পর্কে বলেন,

"আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তিনি ছিলেন এমন বিশালাকৃতির যে, আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সবটুকু স্থান ঢেকে ফেলেছিলেন।"[১১]

---

(৭) কিউপিড, প্রাচীন রোমান ভালোবাসার দেবতা, গ্রিক দেবতা ইরস এর প্রতিদ্বন্দ্বী। জনশ্রুতি মতে, কিউপিড ছিল মারকারির পুত্র, দেবতাদের ডানাওয়ালা বার্তাবাহক। এই দেবতা সাধারণত আবির্ভূত হতো ডানাওয়ালা এক এতিম শিশুর রূপে, সাথে থাকত তার একটি বর্শা এবং তিরভর্তি তূণ। (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ৭৯৬)।

(৮) ইহুদি এবং খ্রিস্টানীয় পরিভাষায় চেরুবিম (একবচনে চেরুব) এর চরিত্র অঙ্কন করা হয় এক স্বর্গীয় ডানাময় জীব হিসেবে যার মধ্যে একই সাথে মানুষ এবং পাখির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১৭৫)। চিত্রকলায় চারপাখা বিশিষ্ট চেরুবিমকে নীল রঙে রঞ্জিত করে আকাশ হিসেবে প্রতীকায়িত করা হয় এবং ছয়পাখা বিশিষ্ট সেরাফিমকে লাল রঙে রাঙিয়ে আগুন বোঝানো হয়। (দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ৬৪৪)।

(৯) ফাতির, ৩৫:১।

(১০) ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংগৃহীত। ইব্‌ন কাসীর এই হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন। আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়াহ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৪৭ দ্রষ্টব্য।

(১১) 'আ'ইশাহহ কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিমে সংগৃহীত, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ১১১-১১২, হাদীস

www.pathagar.com

জাবির বিন 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেন,

"আমাকে আরশ বহনকারীদের[১২] ব্যাপারে বলতে দাও। তাদের একজনের কানের লতি আর কাঁধের মাঝে দূরত্ব হলো একটি পাখির সাতশ বছরের ওড়ার[১৩] দূরত্বের সমান।"[১৪]

কুর'আন এবং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, বিশেষ প্রয়োজনে ফেরেশতারা মানুষের আকার ধারণ করতে পারেন। কুর'আনে বর্ণিত মারইয়াম ﷺ এর ঘটনায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ফেরেশতা জিবরীল মানুষের রূপে তাঁর কাছে আগমন করে তাঁকে তাঁর আসন্ন গর্ভধারণের সংবাদ দিয়েছিলেন।[১৫] রসূল ﷺ এর সাথেও অনেক সময় ফেরেশতা জিবরীল মানুষের বেশ ধারণ করে দেখা করতে আসতেন। রসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাতকালে অনেক সময় সহাবারাও তাঁকে দেখেছেন। কখনো সুদর্শন সহাবি দিহ্ইয়াহ ইব্ন খলীফাহ আল-কালবি,[১৬] কখনো বা অপরিচিত বেদুইনের বেশে[১৭]। ফেরেশতারা পুরুষের বেশে আগমন করলেও, তাদেরকে পুরুষ বা মহিলারূপে গণ্য করা হয় না[১৮]; আর তাদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়

নং ৩৩৭।

(১২) কুর'আন, ৬৯:১৭, বলা হয়েছে বিচারদিবসে আল্লাহর আরশকে ৮ জন ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে।

(১৩) এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন ইব্ন আবী হাতিম যিনি এই হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। আনাস ইব্ন মালিকের বর্ণনায়ও এই হাদীসটি এসেছে যা আত-তাবারানী কর্তৃক আল-মু'জাম আল-আওসাত এ সংগৃহীত, যেখানে এই দূরত্বকে উড়ন্ত পাখির ওড়ার যে পরিসর ততটুকু হিসেবে বলা হয়েছে।

(১৪) সুনান আবু দাউদ, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১৩২৩, হাদীস নং ৪৭০৯ এবং আল-আলবানি তার গ্রন্থ সিলসিলাহ আল-আহাদীস আস-সহীহাহ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৭২, হাদীস নং ১৫১ তে সহীহ বলেছেন।

(১৫) মারইয়াম, ১৯:১৬-১৭।

(১৬) মুসনাদে আহমাদ ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ১৪৬ এবং ইব্ন সা'দ এর আত-তাবাক্বাত এ সংগৃহীত। সিলসিলাহ আল-আহাদীস আস-সহীহাহতে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১০৫, হাদীস নং ১১১১।

(১৭) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ১৭, হাদীস নং ৭ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৯-১০, হাদীস নং ১৮।

(১৮) হারুত এবং মারুতের গল্পে যৌন তাড়নার কথা উল্লেখ আছে, যেমন ইব্ন আবী শায়বাহ, 'আবদ ইব্ন হুমায়দ, ইব্ন আবী আদ-দুনইয়া (আল-'উকুবাত গ্রন্থে), ইব্ন জারীর, ইব্ন আল-মুনযির, ইব্ন আবী হাতিম এবং আল-বাইহাকি (শু'আব আল-ঈমান গ্রন্থে), ইহুদিবাদ থেকে

www.pathagar.com

না। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বা নারী হিসেবে অভিহিত করায়(১৯) কুর'আনে আরব মুশরিকদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

মুসলিম সমাজে ফেরেশতাদের বিভিন্ন নাম প্রচলিত রয়েছে।(২০) তবে সেগুলোর মধ্যে অল্প কিছু নামই সঠিক হিসেবে প্রমাণিত। যেমন, ওয়াহ্‌য়ি নাযিলের ফেরেশতার নাম হলো জিবরীল, বৃষ্টির ফেরেশতার(২১) নাম হলো মিকা'ঈল(২২), শিঙায় ফুঁক দিয়ে দুনিয়া ধ্বংসের(২৩) ফেরেশতা হলেন ইসরাফীল(২৪), জাহান্নামের প্রহরীদের প্রধান(২৫) ফেরেশতার নাম হলো মালিক, মৃত্যুর পর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফেরেশতাদ্বয়ের নাম মুনকার এবং

ধর্মান্তরিত মুসলিম কা'ব আল-আহবার (আস-সুয়ুতির আদ-দুর আল-মানসূর ফী আল-মা'সূর ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪০ দ্রষ্টব্য) থেকে যে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন, তাতে অনেক মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদের কাছে এরূপ প্রতীয়মান হয়েছে যে, ফেরেশতাদের লিঙ্গ আছে, কিন্তু তারা এর মাধ্যমে প্রজনন কাজে অংশ নেয় না। (শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া, পৃষ্ঠা ৩১৯ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এই সবগুলো বর্ণনাই জাল। এই গল্পগুলো কুর'আন বা হাদীসের কোথাও নেই, এগুলো একটি ইহুদি মিদরাশ থেকে আমদানিকৃত, নিউ টেস্টামেন্টেও এইসব গল্পের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। (শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া, পৃষ্ঠা ১৩৫)।

(১৯) আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৯-৫৫ এবং আয-যুখরুফ ৪৩:১৯।

(২০) ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

(২১) শারহ আল-''আকীদাহ আত-তাহাউইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

(২২) দ্রষ্টব্য কুর'আন, ২:৯৭-৯৮।

(২৩) আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৪৫ দ্রষ্টব্য।

(২৪) এটি একটি একক শব্দ যার একটি আঞ্চলিক রূপ হলো 'ইসরাফীন', (মুখতার আস-সিহাহ, পৃষ্ঠা ২৯৬ দ্রষ্টব্য), সম্ভবত হিব্রু শব্দ 'সেরাফিম' (শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৮৪) থেকে এর উৎপত্তি। এটি লক্ষণীয় বিষয় যে, এই ফেরেশতার যে বর্ণনা শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম বইয়ে দেওয়া হয়েছে, ইসলামে তার কোনো ভিত্তি নেই এবং প্রচলিত জনশ্রুতি ও লোক-উপাখ্যান থেকে সৃষ্ট।

(২৫) আয-যুখরুফ, ৪৩:৭৭।

www.pathagar.com

নাকীর[২৬], ব্যাবিলনের মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য[২৭] প্রেরিত ফেরেশতাদ্বয়ের নাম হারুত[২৮] এবং মারুত[২৯]।

আসমান এবং জমিনের তত্ত্বাবধানেও অনেক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটছে, আল্লাহ ﷻ তা তাদের মাধ্যমেই সম্পাদন করেন[৩০]। কিছু ফেরেশতাকে মানুষের মনের খবর জানার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। মানুষের মনের ইচ্ছা আমল-লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ জানেন। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন,

> *"ফেরেশতাগণ আবেদন জানায়, হে প্রতিপালক! তোমার এ বান্দা, পাপ কর্মের ইচ্ছা করছে; যদিও আল্লাহ ﷻ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত, তিনি উত্তর দেন অপেক্ষা করো, যদি তা সম্পাদন করে ফেলে, তবে ততটুকু লিখবে যতটুকু সে করেছে; আর যদি পরিত্যাগ করে তবে তার বদলে একটি সাওয়াব লিখে দিবে। কারণ আমার জন্যই সে তা পরিত্যাগ করেছে।"*[৩১]

স্বভাবগতভাবেই ফেরেশতাগণ আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ ﷻকে অমান্য করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের নেই[৩২]। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের ছোট-বড় সকল কিছুতেই তারা বিভিন্ন রকম দায়িত্ব পালন করে; এমনকি কবরের জীবনেও।

---

(২৬) দুটি নামই এসেছে আরবি ধাতু নাকিরা থেকে, যার অর্থ হলো 'নষ্ট, শয়তান, অধম বা অপবিত্র হয়ে যাওয়া'। মুনকার শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'এমন যেকোনো কাজ যাকে খারাপ, ঘৃণ্য এবং জঘন্য মনে করা হয়' এবং নাকীর মানে হলো 'সমর্থন না দেওয়া, কিংবা এ ধরনের কিছু'। (অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন ভলিউম ০২, পৃষ্ঠা ২৮৪৯-২৮৫১)।

(২৭) আল-বাক্বারাহ, (২):১০২।

(২৮) বিদেশী শব্দ হিসেবে ধরা হয়। (অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, ভলিউম ০২, পৃষ্ঠা ২৮৯০)।

(২৯) আরবি অভিধান সংকলকদের মতে, এই শব্দটির মূল বিদেশী কোনো শব্দ অথবা এর উৎপত্তি মুরূতাহ শব্দ থেকে। মুরূতাহ বলতে এমন কোনো মরুভূমি বোঝায় যেখানো কোনো পানি বা গাছ নেই। (অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, ভলিউম ০২, পৃষ্ঠা ২৭০৩)।

(৩০) শারহ আল-'আক্বীদাহ আত-তাহাউইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৫। আন-নাযি'আত, ৭৯:৫ এবং আয-যারিয়াত, ৫১:৪ দ্রষ্টব্য।

(৩১) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৭৫, হাদীস নং ২৩৫।

(৩২) আন-নাহল, ১৬:৪৯-৫০।

www.pathagar.com

মায়ের গর্ভে মানবশিশুর ভ্রূণ অস্তিত্ব লাভ করা থেকে নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ নানা দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহর যে নির্দেশনা রয়েছে তা তারা বাস্তবায়ন করেন। আনাস ইব্ন মালিক ﷺ বর্ণনা করেন,

"আল্লাহ ﷻ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। সে বলে, হে প্রভু! এটি নুতফাহ। হে প্রভু! এটি 'আলাকাহ। হে প্রভু! এটি মুদগাহ। আল্লাহ ﷻ যখন তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু। এটি নর হবে, না নারী?...।"[৩৩]

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ থেকে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রবিন্দুরূপে জমা থাকে। তারপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং তারপর চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড আকারে। তারপর আল্লাহ ﷻ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে রিযক্, হায়াত, 'আমাল ও সে দুর্ভাগা হবে না সৌভাগ্যবান—এ চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর ফেরেশতা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন।"[৩৪]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রত্যেকটি মানুষের সাথে একজন সার্বক্ষণিক ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে; যিনি তাকে ভালো কাজে উৎসাহ যোগান এবং খারাপ কাজ থেকে সতর্ক করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"প্রত্যেক মানুষের সাথে সঙ্গী হিসেবে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান নিয়োজিত রয়েছে।"[৩৫]

---

(৩৩) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০৮, হাদীস নং ৫৯৪, পৃষ্ঠা ৩৮৮ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৩৯১, হাদীস নং ৬৩৯৭।

(৩৪) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০৮, হাদীস নং ৫৯৩ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৩৯১, হাদীস নং ৬৩৯০।

(৩৫) মুসনাদ আহমদ এবং সহীহ মুসলিমে সংগৃহীত ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪৭২, হাদীস নং ৬৭৫৮।

www.pathagar.com

এই ফেরেশতার দায়িত্ব হলো, সে তাকে আল্লাহর ইচ্ছায় সৎপথে চলার নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে[৩৬]। কুর'আনে এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক[৩৭] আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।"[৩৮] তবে, কখনো কখনো এই ফেরেশতারা তাদেরকে ত্যাগ করে চলে যায়। যেমন, আবু তালহা ﷺ বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেন,

"যে ঘরে প্রাণীর ছবি অথবা কুকুর থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।" [৩৯]

মানুষের আমলনামা লিখে রাখার জন্য প্রত্যেকের সাথে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। কুর'আনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

"আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ রয়েছেন। সম্মানিত লেখকবৃন্দ।"[৪০] [ইনফিতার, ৮২:১০-১১]

আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল ﷺ তাদের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে,

"যখন কোনো মুসলিম পাপ কাজ করে তখন বামদিকের ফেরেশতা ছয় ঘন্টার জন্য তার কলম তুলে রাখে। যদি সে এর মধ্যে তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সেটি আর লিপিবদ্ধ করা হয় না। অন্যথায় তা লিখে রাখা হয়।"[৪১]

---

(৩৬) আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৫২ দ্রষ্টব্য।

(৩৭) এই আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হলো মু'আক্কিবাত, ইব্ন ''আব্বাস এর অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা প্রতিটি মানুষকে রক্ষা করার কাজে ততক্ষণ নিয়োজিত থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ ﷻ তার উপর কোনো শাস্তি আরোপ করেন। আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৫০ দ্রষ্টব্য।

(৩৮) আর-রা'দ, ১৩:১১।

(৩৯) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮, হাদীস নং ৪৪৮।

(৪০) আল-ইনফিতার, ৮২:১০-১১।

(৪১) আত-তাবারানী কর্তৃক আল-মুজ'আম আল-কাবীর গ্রন্থে সংগৃহীত। আল-আলবানি সহীহ আল-জামি' আস-সাগীর বইয়ের ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৪২২, হাদীস নং ২০৯৭ এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

www.pathagar.com

এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা বিভিন্ন সময়ে মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। যেমন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমাদের কেউ যখন সলাতে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ ﷻ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ ﷻ! তার প্রতি রহম করুন। যতক্ষণ কেউ সলাত শেষ না করে অথবা তার উদূ ভঙ্গ না হয় এ দু'আ চলতে থাকে।"(৪২)

মানুষের মৃত্যুর সময় তার জান কবজ করার জন্যও নির্দিষ্ট ফেরেশতা রয়েছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে রয়েছে,

"আর তিনিই নিজ বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তোমাদের জন্য হিফাজতকারীদেরকে প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়; আর তারা (হুকুম পালনে) কোনো ত্রুটি করে না।"(৪৩)।

আবার, অন্য কিছু ফেরেশতার দায়িত্ব হলো মানুষের প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বজগতের এক ভ্রমণ শেষে আবার এই দুনিয়াতে (কবরে) ফিরিয়ে আনা। বারা' ইব্ন 'আযিব থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে পরকালের জীবনে প্রবেশ করার সময় সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল চেহারার কিছু ফেরেশতা আসমান থেকে সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে অবতরণ করেন। তারা এসে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসেন। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার পাশে বসে বলে, 'হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির দিকে চলো।' এরপর সে আত্মা পানির পাত্র থেকে গড়িয়ে পড়া পানির ফোঁটার মতো (সহজে) বেরিয়ে আসে এবং ফেরেশতা সে আত্মাকে আলতো করে ধরেন। এরপর মুহূর্তের মধ্যে অন্য ফেরেশতারা তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে নেয় এবং সুগন্ধিযুক্ত কাপড়ে জড়িয়ে রাখে। এরপর সে আত্মা থেকে এমন এক সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে যা দুনিয়ার সবচেয়ে সুমিষ্ট মৃগনাভির গন্ধের মতো। তারপর সে ফেরেশতারা যখন উপরে উঠতে থাকে, তখন তারা যেসব ফেরেশতাদের অতিক্রম করে তারা সকলে জিজ্ঞেস করে, 'কে এই নেক

(৪২) সহীহ্ আল-বুখারি, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ২৯৯, হাদীস্ নং ৪৫২।
(৪৩) আল-আন'আম ৬:৬১ এবং আস-সাজদাহ, ৩২:১১।

www.pathagar.com

আত্মা?' দুনিয়াতে লোকেরা তাকে সবচেয়ে উত্তম যে নামে ডাকতো সে নাম নিয়ে বলা হয়, 'অমুকের পুত্র অমুক'। এরপর তারা তাকে প্রথম আসমানে নিয়ে আসে এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে বলে। এভাবে প্রতিটি আসমান থেকে ফেরেশতারা এসে তাকে পথপ্রদর্শন করে পরবর্তী আসমানে পৌঁছে দেয়। এভাবে সে সপ্তম আসমানে পৌঁছে। মহান আল্লাহ ﷻ তখন বলেন, 'আমার বান্দার 'আমালনামা 'ইল্লিয়্যুন' এ সংরক্ষণ করো[৪৪] এবং তাকে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে যাও। কেননা আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, আর সেখানেই আমি তাদেরকে ফেরত পাঠাব, এরপর সেখান থেকেই তাদের পুনরুত্থিত করব'[৪৫]। এরপর তার আত্মা পুনরায় তার দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়...।"[৪৬]

"এরপর কবরে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত দুইজন ফেরেশতা তার কাছে আসে, তাকে উঠিয়ে বসায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার রব কে?' সে জবাব দেয়, 'আমার রব হলেন আল্লাহ ﷻ।' তারপর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার দীন কী?' সে জবাব দেয়, 'আমার দীন হলো ইসলাম।' তারা জিজ্ঞেস করে, 'এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল?' সে বলে, 'ইনি হলেন আল্লাহর রসূল।' এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার জ্ঞানের উৎস কী ছিল?' সে উত্তর দেয়, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সত্য হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছি'।"[৪৭]

---

(৪৪) "না, নিশ্চয়ই সৎলোকদের 'আমালনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কী? স্পষ্টভাবে লিখিত নিবন্ধগ্রন্থ।" কুর'আন, ৮৩:১৮-২০।

(৪৫) এই কথাটি কুর'আনের এই আয়াতের সাথে মিলে যায়: "এ থেকে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আর এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব, আর এ থেকেই আমরা তোমাদের বের করে আনব দ্বিতীয় দফায়।" কুর'আন, ২০:৫৫।

(৪৬) মুসনাদ আহমদ এবং সুনান আবু দাউদ, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১৩৩০, হাদীস্ নং ৪৭৩৫ কর্তৃক সংগৃহীত। আল-আলবানি সহীহ্ আল-জামি' আস-সাগীর, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৬, হাদীস্ নং ১৬৭৬ এ সহীহ্ বলেছেন।

(৪৭) আরও দেখুন, সহীহ্ বুখারি, ভলিউম ০২, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮, হাদীস্ নং ৪৫৬।

www.pathagar.com

মানুষের ব্যক্তিত্বে ফেরেশতায় বিশ্বাসের প্রভাব

ফেরেশতা হলো আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি যাকে বিজ্ঞান কখনোই আবিষ্কার করতে পারেনি এবং পারবেও না; যতই প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হোক না কেন। তবে মানুষ বিশ্বাস করুক কিংবা না করুক, আল্লাহর তাতে কিছু আসে যায় না। কল্যাণের জন্যেই আল্লাহ ﷻ মানুষকে ফেরেশতাদের জগৎ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও মানুষের জীবনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানলে মানুষ নিজেই উপকৃত হবে। মানুষের প্রতিটি কাজ, এমনকি তাদের মনে উদিত ভাবনাগুলোও যে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, তা মনে থাকলে মানুষ যেকোনো কাজের আগে ভাববে। নিছক ঝোঁকের মাথায় কিছু করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা রসূল ﷺ সতর্ক করে দিয়েছেন:

"সতর্ক এবং সুচিন্তিত কাজ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।"(৪৮)

জিনের উপর বিশ্বাস

ফেরেশতা জগতের উপর বিশ্বাসের মধ্যে আরেক অদৃশ্য সৃষ্টি জিনও অন্তর্ভুক্ত। জিন সম্পর্কে নানা রকম কুসংস্কার ও রূপকথার গল্পের মতো অবিশ্বাস্য অনেক কিচ্ছা-কাহিনির কারণে আধুনিকমনা কিছু অজ্ঞ মুসলিম গোটা গায়েবের জগতকেই অস্বীকার করে বসে। কিন্তু আল কুর'আনের ৭২তম সূরাটির নামই হলো 'আল জিন'। এ সূরাসহ আরও অনেক স্থানেই জিনদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

'জিন' শব্দটির উৎপত্তি 'জান্না' ক্রিয়ামূল থেকে। এর অর্থ হলো 'ঢেকে দেওয়া, লুকিয়ে রাখা বা গোপন করা'। এরা আল্লাহরই একটি সৃষ্টি, যারা এই পৃথিবীতেই বসবাস করে। আল্লাহ ﷻ ভিন্ন উপাদান দিয়ে মানুষের পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

(৪৮) বাইহাকি, আবু ইয়া'লা ও আত তাবরানী

www.pathagar.com

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। আর ইতিপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।"

[আল-হিজ্‌র, ১৫:২৬-২৭] (৪৯)

তাদের 'জিন' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে একারণে যে, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে থাকে। ইবলীস (শয়তান) জিন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

অস্তিত্বের দিক থেকে জিনদেরকে প্রধানত: তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। রসূল ﷺ বলেছেন,

"তিন ধরনের জিন আছে। এক দল সারাদিন বাতাসে ভেসে বেড়ায়, আরেক দল সাপ ও কুকুরের বেশ ধরে থাকে এবং আরেক ধরনের ভূমিবাসী জিন আছে যারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।"(৫০)

বিশ্বাসের দিক থেকে জিনদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: ১. মুসলিম বা আল্লাহর অনুগত ২. কাফির বা আল্লাহর অবাধ্য(৫১)। জিনদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে আরবি এবং বাংলা ভাষায় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যেমন 'ইফরীত, শাইতান, কারীন, পিশাচ, প্রেত, অপদেবতা, ভূত-পেত্নি ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন পন্থায় মানুষকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করে। যারা তাদের কথা শোনে এবং তাদের হয়ে কাজ করে তারা হলো, 'মানুষ শয়তান'।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবির শত্রু করেছি মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে...."(৫২) [আল-আন'আম ৬:১১২)

---

(৪৯) আল-হিজ্‌র, (১৫):২৬-২৭।

(৫০) আত-তাবারী এবং আল-হাকিম এ সংগৃহীত।

(৫১) আল-জিন, ৭১:১-৪ এবং ১৪-১৫।

(৫২) আল-আন'আম, ৬:১১২।

www.pathagar.com

প্রতিটি মানুষের সাথে একটি করে জিন থাকে, যাকে বলা হয় কারীন বা সঙ্গী। এই জিন তার জীবনের জন্য একটি পরীক্ষা। সে তাকে প্রবৃত্তির গোলামীতে প্ররোচনা দেয় এবং সারাক্ষণ তাকে ভুল পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। রসূল ﷺ এই জিনের ব্যাপারে বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই একটি শয়তান নিয়োজিত আছে। সহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে তার মোকাবিলায় আল্লাহ ﷻ আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে কেবল আমাকে ভাল কাজে উৎসাহ দেয়'।"(৫৩)।

নাবি সুলাইমান ﷺ-কে নুবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল(৫৪)। এ ক্ষমতা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। রসূল ﷺ একবার বলেন,

"গতরাতে একটি দুষ্ট জিন(৫৫) আমার সলাত নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তার উপর আমাকে ক্ষমতা দান করলেন। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, তাকে মসজিদের কোনো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি; যাতে তোমরা সবাই ভোর বেলা তাকে দেখতে পাও। পরে আমার ভাই সুলাইমানের দু'আর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন- হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন সালতানাত (রাজত্ব) দান করো যা আমার পর অন্য কেউ না পায়(৫৬)।"(৫৭)

ভাগ্য গণনা

জিনের উপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কেননা এই অলৌকিক ক্ষমতা কেবল নাবি সুলায়মানকেই দেওয়া হয়েছিল। দুর্ঘটনা কিংবা

(৫৩) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪৭২, হাদীস নং ৬৭৫৭।

(৫৪) আন-নাম্‌ল, ২৭:১৭।

(৫৫) একটি শক্তিশালী ক্ষমতাধর জিন (E.W.Lane, অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, (ক্যামব্রিজ, ইংল্যান্ডঃ ইসলামিক টেক্সটস সোসাইটি, ১৯৮৪), ভলিউম ০২, পৃষ্ঠা ২০৮৯।

(৫৬) সা'দ ৩৮:৫৫।

(৫৭) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ২৬৮, হাদীস নং ৭৫ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ২৭৩, হাদীস নং ১১০৪।

www.pathagar.com

জিনের আছর ছাড়া অন্য কোনোভাবে মানুষের পক্ষে জিন জাতির সংস্পর্শে আসা সম্ভব নয়। এটা একমাত্র আল্লাহদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হতে পারে, যা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নিষিদ্ধ(৫৮)। জিন শয়তানদেরকে আহ্বান করা হয় তার সঙ্গী-সাথীদেরকে পাপ এবং কুফরিতে লিপ্ত করতে সাহায্য করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্যই হলো যথাসম্ভব বেশি মানুষদেরকে শির্ক কুফরসহ নানারকম নিকৃষ্ট পাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট করা। গণকরা জিনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে তাদের থেকে তারা ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা সম্পর্কে আগাম তথ্য লাভ করতে পারে। কীভাবে জিনরা কোনো ঘটনার আগাম তথ্য জোগাড় করে তা রসূল ﷺ নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন জিনরা আসমানের নিচের দিকের অংশে ভ্রমণ করতে পারত এবং সেখানে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে ফেরেশতাদের কথোপকথন শুনতে পেত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের মানব বন্ধুদের কাছে সে তথ্য পৌঁছে দিত(৫৯)। রসূল ﷺ এর নুবুওয়াতের আগে এমন হরহামেশা ঘটত এবং জ্যোতিষী-গণকদের কথাবার্তা প্রায়ই মিলে যেত। এই গণকেরা তখন রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করত, রাজসভায় স্থান পেত এবং কিছু ধর্মে তাদেরকে মানুষ উপাসনাও করত।

কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওওয়াতপ্রাপ্তির পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গেল। আল্লাহ ﷻ ফেরেশতাদের নিযুক্ত করলেন নিচ আসমান ভালো করে পাহারা দিতে। তারা জিনদেরকে তারকা ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু করে(৬০)। ইবন্ 'আব্বাস ﷺ বলেন,

> *"একদিন রসূল ﷺ একদল সহাবিকে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানি খবরাদি শুনতে বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করা হয়। জিন শয়তানরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে আসমানি খবরাদি শোনার ব্যাপারে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন শয়তান বলল, এটা অবশ্যই কোনো নতুন*

(৫৮) আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, ইব্‌ন তাইমিয়্যাহর জিন বিষয়ক প্রবন্ধ, (রিয়াদঃ তাওয়াহিদ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯) পৃষ্ঠা ২১।

(৫৯) সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ১২১০, হাদীস্ নং ৫৫৩৮।

(৬০) আল-জিন ৭২:৮-৯ এবং আল-হিজ্‌র ১৫:১৭-১৮।

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটার কারণেই হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ কী ঘটেছে? কারণ খুঁজতে তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তারা 'নাখলা' নামক স্থানে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে উপস্থিত হলো। তিনি এখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার জন্য ঠিক করেছিলেন। এ সময় আল্লাহর রসূল ﷺ সহাবিদের নিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি মনোযোগ দিয়ে কুর'আন শুনতে লাগল এবং বলল, আসমানি খবরাদি এবং তোমাদের মাঝে এটিই মূলত বাধা সৃষ্টি করেছে। তারপর তারা তাদের জাতির কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের জাতি! আমরা এক বিস্ময়কর কুর'আন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না।"।

[আল-জিন ৭১:১-২]

এরপর থেকে জিনদের পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ আর সম্ভব হয়নি। একারণেই, তারা এখন কিছু সত্যের সাথে অনেক মিথ্যা মিশিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে। রসূল ﷺ বলেছেন,

"তারা তথ্য আদান-প্রদান করতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে গিয়ে তা জাদুকর ও গণকদের কাছে পৌঁছায়। কখনো কখনো তথ্য প্রদানের আগেই উল্কাপিণ্ড তাদের আঘাত করে। আক্রান্ত হবার আগেই তারা যদি তা পৌঁছে দিতে পারে তাহলে তার সাথে আরও শত মিথ্যা মিলিয়ে তারা পরিবেশন করে।"(৬১)

'আ'ইশাহ ؓ বর্ণনা করেন, তিনি রসূল ﷺ এর কাছে জ্যোতিষীদের কথাবার্তার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এগুলো সত্য নয়। তিনি তখন বলেন যে, গণকদের কিছু কথা তো ফলে যায়। তখন রসূল ﷺ বললেন,

"সত্য কেবল ততোটুকুই যতোটুকু জিনেরা লুকিয়ে শুনে ফেলে এবং পরে তাদের দোসরদের কানে ঢেলে দেয়। তারা এর সাথে শত মিথ্যা মিশ্রিত করে বলে"(৬২)।

---

(৬১) সহীহ্ আল-বুখারি, ভলিউম ০৮, পৃষ্ঠা ১৫০, হাদীস্ নং ২৩২ এবং আত-তিরমিযি।
(৬২) সহীহ্ আল-বুখারি, ভলিউম ০৭, পৃষ্ঠা ৪৩৯, হাদীস্ নং ৬৫৭ এবং সহীহ্ মুসলিম,

www.pathagar.com

জিনরা তুলনামূলক নিকট ভবিষ্যতের খবর তাদের মানব-দোসরদেরকে দিতে পারে। যেমন, কেউ যদি গণকের কাছে আসে, তাহলে গণকের জিন সেই লোকের কারীন[৬৩] এর কাছ থেকে জানতে পারে, সে কী কী পরিকল্পনা করেছে। তখন গণক হয়তো বলে দিতে পারে, সে কী করবে, বা কোথায় যাবে। এভাবেই জিনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী গণক অপরিচিত ব্যক্তির অতীত সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারে। সে তার বাবা-মায়ের নাম, সে কোথায় জন্ম নিয়েছে, ছেলেবেলায় সে কী করেছে ইত্যাদি বলে দিতে পারে। যদি কোনো গণক পরিষ্কারভাবে কারো অতীত সম্পর্কে বলে দিতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে, সে আসলেই গণক এবং জিনদের সাথে তার যোগাযোগ আছে। জিন জাতি যেহেতু মানুষের তুলনায় বহু গুণ দ্রুত বেগে স্থান অতিক্রম করতে পারে, তাই তারা গোপন জিনিসের সংবাদ, হারিয়ে যাওয়া বস্তু এবং অদেখা অনেক ঘটনার বিবরণ দিতে পারে। কুর'আনে বর্ণিত সুলাইমান ﷺ এর ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাবার রাণী বিলকিস যখন সুলায়মানকে দেখতে আসলেন, তখন তিনি তার জিনদেরকে আদেশ করেছিলেন যেন তারা রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসনটি এনে হাজির করে।

"এক শক্তিশালী জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[৬৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে ভাগ্যগণনা একটি চরম আল্লাহদ্রোহিতা ও পথভ্রষ্টতা। তাই এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানও অত্যন্ত কঠোর। জ্যোতিষী ও গণক শ্রেণির লোকদের সাথে ইসলাম সকল প্রকার সম্পর্ক ও সাহচর্যকে নিষিদ্ধ করেছে; একমাত্র তাদেরকে এই গর্হিত কাজ পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত। সাফীয়াহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা হাফসাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি (গণক) আবু রাফের কাছে গেল এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ রাত তার কোনো সলাত কবুল করা হবে না।"[৬৫]

ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩৫।

(৬৩) প্রত্যেকটি মানুষের সাথে এই জিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

(৬৪) আন-নাম্‌ল ২৭:৩৯-৪০।

(৬৫) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০১৪, পৃষ্ঠা ১২১১, হাদীস নং ৫৫৪০।

www.pathagar.com

কেবল কৌতূহলবশত গেলেই এই শাস্তি বরাদ্দ, এজন্যে গণকের কথা বিশ্বাস করা জরুরি নয়। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি আরও একটি হাদীস দ্বারা সমর্থিত, যেখানে মু'আউইয়াহ ইব্‌ন আল-হাকাম আস-সালামি ؓ বর্ণনা করেন, তিনি রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

"ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে যায়। রসূল ﷺ বলেন, 'তাদের কাছে যেও না'।"(৬৬)

শুধুমাত্র গণকের সাথে দেখা করার অপরাধেই এ শাস্তির কারণ হলো, এটা তাদেরকে বিশ্বাস করার সর্বপ্রথম ধাপ। গণকদের ব্যাপারে অনেকে যদিও প্রথমে দ্বিধায় থাকে, কিন্তু তাদের কোনো কথা-বার্তা সত্যি হয়ে গেলে একদিন সে তাদের একান্ত ভক্তে পরিণত হয় এবং ভাগ্যগণনার উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করে।

গণকের কাছে যাওয়ার কারণে ৪০ দিনের সলাতের কোনো সওয়াব না পেলেও এ সময়ের ফার্দ সলাহ তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। সলাহ ত্যাগ করলে সে আরও বড় পাপ করলো। ফার্দ সলাহ আদায়ের কমপক্ষে দুটো ফল আছেঃ (১) একটি ফার্দ হুকুম পালন, (২) পুরস্কার লাভ। গণকের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৪০ দিনের পুরস্কার বাতিল হলেও, ফার্দ হুকুম আদায়ের বিধান থেকে সে মুক্ত নয়।

কোনো গণক গায়বের জ্ঞান রাখে মনে করে তার কাছে যাওয়া হলো কুফরি। আবু হুরাইরাহ ও আল হাসান ؓ দুজনেই বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদের আনীত দীনকে অস্বীকার করল।"(৬৭)

অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে; এ গুণ কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। গণকের কথায় বিশ্বাস করলে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এ গুণ তাঁর সৃষ্টির উপর আরোপ করা হয়। তাই, এটি এক ধরনের

---

(৬৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০৯, হাদীস নং ৫৫৩২।

(৬৭) ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংগৃহীত। সুনান আবু দাউদ, ইংলিশ ট্রান্সলেশন, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১০৯৫, হাদীস নং ৩৮৯৫ এবং আল-বাইহাকি

www.pathagar.com

শির্ক। যারা গণকের কাছে সশরীরে যায় না, কিন্তু তাদের বই-পুস্তক বা পত্র পত্রিকায় তাদের রাশিচক্র বিষয়ক কলাম পড়ে, রেডিও, টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেটে তাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করে, তাদের উপরও কুফুরীর এ অভিযোগ প্রযোজ্য। কেননা কালের বিবর্তনে মাধ্যম পরিবর্তন হলেও মূল বিষয় এখানে একই। তাই মাধ্যম যা-ই হোক না কেন তাদের সাক্ষাৎ বা সংস্পর্শে আসা হারাম। হাতদেখা, I-Ching, ভাগ্যবিস্কুট, চায়ের পাতা, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ পর্যবেক্ষণ এবং Biorhythm কম্পিউটার প্রোগ্রাম, এর সবগুলোই ভবিষ্যৎ জানে বলে দাবি করে। অথচ আল্লাহ ﷻ কুর'আনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, গায়বের বিষয় একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে; আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা আছে, তা কেবল তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [লুকমান, ৩১:৩৪]

কাজেই, বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্রে যারা অদৃষ্টের জ্ঞানের দাবি করেন, তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের খুবই সতর্ক হতে হবে। কোনো মুসলিম আবহাওয়াবিদ যখন অনুমান করেন পরের দিন বৃষ্টি, তুষারপাত কিংবা অন্য কোনো জলবায়ুগত পরিবর্তন ঘটবে তখন তার উচিত, 'ইন শা আল্লাহ' বলা। তেমনি যখন কোনো মুসলিম চিকিৎসক গর্ভবতী পেশেন্টকে তার সন্তান প্রসবের তারিখ জানান, তখন তার অবশ্যই 'ইন শা আল্লাহ' বলা উচিত। কেননা, এ ধরনের অনুমান নিছক পরিসংখ্যান নির্ভর, নির্ভুলভাবে তা একমাত্র আল্লাহ ﷻই জানেন।

জাদুটোনা

মানুষের জীবনে আরও যে ক্ষেত্রটিতে জিনরা হস্তক্ষেপ করে সেটি হলো জাদুটোনার রাজ্য। যদিও এ যুগে জাদুটোনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার ফ্যাশনটি বেশ জনপ্রিয়; তথাপি পশ্চিমা দুনিয়াতে জাদুবিদ্যর প্রদর্শনীতে

www.pathagar.com

উপচে পড়া ভীড় ঠিকই আছে। প্রাচ্যে প্রচলিত 'কালো জাদু'র প্রতিক্রিয়াকে মানসিক রোগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়। অনেকেই মনে করেন যে, জাদু কেবল তাদেরকেই প্রভাবিত করতে পারে, যারা তাতে বিশ্বাস করে(৬৮)। জাদুবিদ্যাকে নজরবন্দি এবং কৌশলের ভেলকিবাজি হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া হয়।

কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিরোধের জন্য যেসব জাদু এবং তাবিজ-কবচ করা হয় তার কার্যকারিতা ইসলামে যদিও অস্বীকার করা হয়, তথাপি ইসলাম জাদুর কিছু কিছু দিককে স্বীকার করে। এটি সত্য যে, বর্তমান জমানায় বেশিরভাগ জাদুই হলো হাতের কৌশল অথবা কিছু যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা ভেলকিবাজি। তবে এমন কিছু গণকও আছে, যারা জিনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাদুবিদ্যার চর্চা করে। কুর'আনে আল্লাহ ﷻ এ সম্পর্কে বলেন,

"আর তারা (ইহুদিরা) অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরি করেনি; বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত।" [আল-বাকারাহ, ২:১০২]

ইহুদিদের মধ্যে 'কাবালা' নামে একটি জটিল আধ্যাত্মিক চর্চা আছে যেটির মাধ্যমে তারা জাদুর অনুশীলন করে। তারা এ জাদু চর্চাকে এই বলে বৈধতা দেয় যে, তারা তা নাবি সুলায়মানের কাছ থেকে শিখেছে। যেসব ইহুদি এ বিদ্যা চর্চা করে তারা ভালো করেই জানে যে, এই কর্মের জন্য তারা অভিশপ্ত হবে। কেননা তাদের কিতাবেই এ কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাওরাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো এখনো বিদ্যমান:

> "যখন ঈশ্বর তোমাকে যে দেশের মালিক করেছেন সেখানে আগমন করবে, তখন তুমি সেসব জাতির খারাপ চর্চাগুলো শিখবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নিজের পুত্র বা কন্যাকে আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ না করে, কেউ যেন ভবিষ্যৎ-কথন না করে, কিংবা কেউ যেন গণক, জাদুকর, ওঝা, মধ্যস্থতাকারী, ভেলকিবাজ বা প্রেতচর্চাকারী না হয়। যে এমনটা করবে, সে

(৬৮) 'আশ'আরি 'আলিম ফাখরুদ-দীন আর-রাযি (মৃত্যু ১২১০ সাল) সূরা বাকারাহর ১০২ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ধারণা উত্থাপন করেন এবং বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, ইব্ন খালদুন এই ধারণাকে আরও সুসংহত করেন।

www.pathagar.com

যেন ঈশ্বরকে চরমভাবে অবজ্ঞা করল এবং তোমাদের এ সকল ঘৃণ্য কাজের জন্য ঈশ্বর তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন"(৬৯)।

সহীহ্ হাদীসের কিছু বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, রসূল ﷺ নিজেও একবার জাদুর শিকার হয়েছিলেন। যাইদ ইব্ন আরকাম ﷺ বর্ণনা করেন, "লাবীব ইব্ন আ'সাম নামের এক ইহুদি রসূল ﷺ এর উপর জাদু করায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর জিবরীল এসে মু'আওওয়াযাতাঈন (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল করেন, এবং তাঁকে বলেন, 'এক ইহুদি ব্যক্তি আপনার উপর জাদুর বাণ নিক্ষেপ করেছে এবং সে কবচটি অমুক কুয়াতে আছে'। রসূল ﷺ 'আলি ইব্ন আবু তালিবকে কবচটি নিয়ে আসতে বলেন। তারপর তিনি তাকে বলেন, সেই কবচ থেকে একটি একটি করে গিঁট খুলে ফেলতে এবং প্রতিটি গিঁট খোলার সময় সূরা দুটি থেকে একটি করে আয়াত পাঠ করতে। 'আলি যখন তা করলেন, রসূল ﷺ উঠে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন যেন তাকে বেঁধে রাখা অবস্থা থেকে মুক্ত করা হয়েছে।"(৭০)

প্রতিটি জাতির মধ্যেই এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা জাদুবিদ্যা চর্চা করে। হতে পারে এগুলোর মধ্যে অনেক কিছুই বানোয়াট। তবে একটি ব্যাপার হলো যে, সকলেই জাদু এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি নিয়ে একই রকমের গল্প ফেঁদেছে। কেউ যদি ভালো করে এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো ঘেঁটে দেখে, তাহলে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এই সব ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। 'ভৌতিক বাসা', আধ্যাত্মিক বৈঠক, ouija board, ভুডু, শয়তানের আছরগ্রস্ত হয়ে কথা বলা, শূন্যে ভাসা ইত্যাদি ঘটনা তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, যারা জিন-জগতের সাথে পরিচিত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এসব ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এমনকি মুসলিম বিশ্বও এথেকে নিস্তার পায়নি। কিছু চরমপন্থী সুফি ও ভণ্ড পীরদের মধ্যে জাদুচর্চার অভ্যাস আছে। তাদের অনেকে শূন্যে ভেসে দেখায়, অনেক লম্বা পথ মুহূর্তে

---

(৬৯) ডিউটেরনমি ১৮:৯-১২।

(৭০) 'আবদ ইব্ন হুমাইদ এবং আল-বাইহাকি কর্তৃক সংগৃহীত এবং হাদীসটির বেশিরভাগ অংশ খুঁজে পাওয়া যাবে সহীহ্ আল-বুখারি, অ্যারাবিক-ইংলিশ, ভলিউমে ০৭, পৃষ্ঠা ৪৪৩-৪, হাদীস নং ৬৬০ এবং সহীহ্ মুসলিম ইংলিশ ট্রান্সলেশন, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১১৯২-৩, হাদীস নং ৫৪২৮।

www.pathagar.com

অতিক্রম করে ফেলে, হঠাৎ শূন্য থেকে খাওয়া-দাওয়া কিংবা অর্থ-কড়ি হাজির করে ইত্যাদি। মূর্খ মুরিদেরা মনে করে এগুলো কোনো অলৌকিক ঘটনা। তারা এসব পীরের সেবায় নিজের জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু এসবের পেছনে আছে জিন জাতির গুপ্ত ও অশুভ কারসাজি।

যদিও জিনদেরকে সাপ ও কুকুরের বেশে[৭১] দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু জিন আছে যারা মানুষের বেশ ধারণ করতে পারে। যেমন, আবু হুরাইরাহ ﷺ বর্ণনা করেন,

"রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একবার রমাদানের যাকাত (সাদাকাতুল-ফিতর) সংরক্ষণ ও পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলেন। রাতে কোনো এক চোর এসে খাদ্যবস্তু আঁজলা ভরে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম, 'আমি তোমাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ধরে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমি একজন অভাবী লোক, অনেকগুলো সন্তানের দায়িত্ব আমার কাঁধে, তাই প্রয়োজনও আমার অনেক বেশি।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু হুরাইরাহ! গত রাতে তোমার কয়েদি কী করল?' আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও সন্তানদের কথা বলল, তাই আমি, দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' কাজেই আমি তাকে ধরার জন্য এবার ওঁৎ পেতে রইলাম। পরের রাতে সে আবার এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু উঠাতে লাগল। আমি বললাম, 'তোমাকে আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, কারণ আমি অভাবী আর অনেকগুলো সন্তানের দায়িত্ব আমার কাঁধে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসব না।' তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি আবারও তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'হে আবু হুরাইরাহ! গতরাতে তোমার বন্দি কী করল?' আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সে অভাব ও সন্তানের কথা বলল। তাই আমি আবারও দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, 'অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' তারপর আমি তৃতীয়বার তাকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে রইলাম। সে এসে খাদ্য বস্তু আঁজলা ভরে সরাতে লাগল।

(৭১) এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণের জন্য ভাগ্য গণনা নিয়ে লেখা অধ্যায় পাঁচ দেখুন, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

www.pathagar.com

আমি তাকে ধরে বললাম, 'আমি এবার অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে যাব। কারণ এ নিয়ে তুমি তিনবার বলেছ যে, তুমি আর আসবে না। কিন্তু প্রত্যেকবারই তুমি ফিরে এসেছ।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব যার দ্বারা আল্লাহ ﷻ আপনাকে অনেক উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলো কী?' সে বলল, 'যখন বিছানায় ঘুমুতে যাবেন আয়াতুল-কুরসি পাঠ করবেন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর সবসময় একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।' এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন ভোরে নাবি ﷺ আমাকে বললেন, 'গতরাতে তোমার কয়েদি কী করল?' আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা আমাকে শিখিয়ে দেবে যার ফলে আল্লাহ ﷻ আমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলো কী?' আমি বললাম, 'সে আমাকে বলল, 'আপনি ঘুমুতে যাবার সময় 'আয়াতুল-কুরসি'[৭২] পড়বেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী সবসময় আপনার ওপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান ভোর পর্যন্ত আপনার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।' একথা শুনে নাবি ﷺ বলেন, 'যদিও সে মিথ্যুক, তবে এ কথাটা সে অবশ্য তোমাকে সত্য বলেছে। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কি জানো, গত তিন দিন ধরে তুমি কার সাথে কথা বলেছ?' আমি বললাম, 'না, আমি জানি না।' তিনি বললেন, 'সে হচ্ছে শয়তান'।"[৭৩]

ইসলামে যেহেতু জাদুবিদ্যার সকল চর্চাকে কুফরি সাব্যস্ত করা হয়, তাই শরী'আহ আইনে জাদু চর্চাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যদি কোনো জাদুকরকে ধরা হয় এবং সে তাওবা করে এই কাজ ত্যাগ না করে, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। জুনদুব ইব্ন কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। রসূল ﷺ এর সহাবারা বলেন,

"জাদুকরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি হলো তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা।"[৭৪]

---

(৭২) আল-বাকারাহ ২:২৫৫।

(৭৩) সহীহ আল-বুখারি, আরবি-ইংরেজি, অধ্যায় ০৯, পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২, হাদীস নং ১০২০।

(৭৪) আত-তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। এই হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে দ'ঈফ (দুর্বল), তথাপি এই হাদীসের বক্তব্য অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এই হাদীসটিকে হাসান

www.pathagar.com

এই আইনটি খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। বাজালাহ ইব্‌ন 'আব্দাহ বর্ণনা করেন, খলীফাহ 'উমার ﵁ রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, অগ্নি-উপাসকদের মধ্যে যারা তাদের মা, মেয়ে বা বোনদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ তারা যেন সে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেয়। অগ্নি-উপাসকদের 'আহলে-কিতাব' গণ্য করে তাদের খাবার খেতে অনুমতি দেওয়া হয়[৭৫]। সবশেষে, তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয় যেন তারা সকল গণক এবং জাদুকরদের খুঁজে খুঁজে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করে। বাজালাহ বলেন, তিনি নিজে এই নির্দেশের ভিত্তিতে তিনজন জাদুকরকে হত্যা করেন[৭৬]। তাওরাত, ইঞ্জিলেও এই একই শাস্তির কথা উল্লিখিত আছে। 'অদৃশ্য আত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দাবিদার নারী-পুরুষ ও জাদুকরদেরকে হত্যা করা হবে; তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে, তাদের রক্ত শরীরে ঢালা হবে।'[৭৭]।

সমাজের দুর্বল ঈমানের লোকেরা যেন জাদুকরদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে শির্কে পতিত না হয়, তার জন্যেই মূলত ইসলামে জাদুর শাস্তি এতটা কঠোর। এ ধরনের ধর্মদ্রোহিতার বিনিময়ে মানুষের অর্থ-কড়ি হাতানো ছাড়াও জাদুকরেরা প্রায়ই নিজেদেরকে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে এবং যশ-খ্যাতি লাভের আশায় নিজেদেরকে ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী বলে প্রচার করে।

(তুলনামূলক সহীহ্) শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। চার ইমামের তিনজনই (আহমাদ, আবু হানীফাহ এবং মালিক) জাদুকরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হিসেবে রায় দিয়েছেন। আর ইমাম, আশ-শাফি'ই রায় দিয়েছেন জাদুকরকে হত্যা করা হবে তখনই যদি তার জাদু কুফর পর্যায়ের হয় (দেখুন তায়সীর আল-'আযীয আল-হামীদ, পৃষ্ঠা ৩৯০-৩৯১)।

(৭৫) যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ন্যায় আসমান থেকে নাযিলকৃত কিতাবের অনুসারী। এই অংশটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারি, আত-তিরমিযি এবং আন-নাসা'ই।

(৭৬) আহমাদ, আবু দাঊদ এবং আল-বাইহাকি কর্তৃক সংগৃহীত।

(৭৭) লেভিটিকাস ২০:২৭।

www.pathagar.com

জিন/শয়তানের আছর

জিনরা মুহূর্তের মধ্যে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। তারা মানবদেহেও প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে এই শক্তি দেওয়ার উপযুক্ত মনে করেছেন বিধায় দিয়েছেন। যেমন তিনি অন্য অনেক সৃষ্টিকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যা মানুষকে দেননি। কিন্তু তারপরেও তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। জিনদের প্রকৃতি ও শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে সুচ্ছ ধারণা থাকলে অনেক অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন কিছু পরিত্যক্ত 'ভুতুড়ে বাড়ি'তে দেখা যায়, এমনি এমনিই আলো জ্বলছে নিভছে, কিংবা কোনো জিনিস শূন্যে ভাসছে, মেঝেতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এগুলো অদৃশ্য অবস্থায় সেখানের মেঝেতে জিনদের হাঁটা-চলা বা আসবাবপত্র নড়াচড়ার কারণে হয়।

এটিও সত্য যে, জাদুচক্রে কখনো বাহ্যিকভাবে এমনও মনে হতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিতদের সাথে কথা বলছে। এসকল চক্রে যারা মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চেনে, তারা হয়তো তাকে তার জীবিত অবস্থার কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে শোনে। এটি মূলত সংঘটিত হয় সেই মৃত ব্যক্তির জিন জীবিত কারো উপর ভর করার মাধ্যমে। এই জিনই মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নকল করে তার অতীত জীবনের ঘটনা বর্ণনা করে। বিভিন্ন দেশে ভাগ্য গণনার জন্য প্রচলিত Ouija board বা Talking board যে প্রশ্নের উত্তর দেয়, তা-ও এমনই একটা ব্যাপার। অদৃশ্য জিনকে কাজে লাগিয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়; অনেক দুষ্ট লোকেরাই এটা করে থাকে। শূন্যে ভাসা কিংবা স্পর্শ না করে কোন বস্তুকে বাতাসে ভাসানোর যেসব ঘটনা দেখা যায় সেগুলো মূলত জিনের অদৃশ্য হাতকে কাজে লাগিয়েই করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে আমরা দেখি কেউ ক্ষণিকের মাঝে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছে কিংবা একই সময় দুটো ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে, এটাও জিনদের কারসাজি। তাদের অদৃশ্য সঙ্গী জিন তাদেরকে মুহূর্তের মাঝে বহন করে নিয়ে যায় এবং জিনই তাদের বেশ ধারণ করে। যেমন, সাই বাবার মতো যারা হাওয়া থেকে খাদ্য এবং টাকা হাজির করতে পারে তাদেরকেও সাহায্য করে এই দ্রুতগামী অদৃশ্য জিন[৭৮]। এমনই একটি আপাত বিস্ময়কর

(৭৮) এ ধরনের আরও ঘটনার জন্য দেখুন ইবন তাইমিয়্যাহর জিন সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটেছিল ভারতে। শান্তি দেবী নামক সাত বছর বয়সী এক বালিকা তার কথিত পুনর্জন্মের কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুরু করে। সে দাবি করে, তার আগেকার জীবনে বাড়ি ছিল মথুরা শহরে যা তার বাসস্থান থেকে বহুদূরের একটি রাজ্যে। তার দেওয়া এ তথ্য যাচাই করতে গেলে স্থানীয় লোকেরাও বলল যে, এধরনের একটি বাড়ি একসময় সে এলাকায় ছিল[৭৯]। তারা তার বলা কিছু ঘটনা সম্পর্কেও নিশ্চিত করল। এ ঘটনার বাস্তবতা হলো, এই তথ্যগুলো জিন তার অবচেতন মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। এই অবচেতন অনুভূতির ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেন,

> *"নিশ্চয়ই মানুষ ঘুমের সময় যে স্বপ্ন দেখে তা তিন ধরনের: এক ধরনের স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে আর তৃতীয়টি হলো অবচেতন মনের স্বপ্ন।"*[৮০]

জিন মানুষের মনে যেমন কুমন্ত্রণা দিতে পারে, তেমনি শরীরেও প্রবেশ করতে পারে। মানুষের শরীরে জিনের আছর হওয়ার অনেক ঘটনা রয়েছে। আছরকৃত লোকটি তখন হয়তো শারীরিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে প্রবলভাবে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। অনেকে এ সময় অচেতন হয়ে পড়ে। তখন জিন তাদের শরীরে প্রবেশ করে তাদের মুখ দিয়ে ভিনদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। এই ধরনের ঘটনা কিছু সুফিবাদী[৮১] ফেরকার যিক্‌রের হালাকায়[৮২] ঘটে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের আছরগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে; সে অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে; অতিমানবীয় শক্তি প্রদর্শন করতে পারে; এমনকি জিন তাকে ব্যবহার করে নিয়মিত কথাও বলতে পারে।

৪৭-৫৯।

(৭৯) কলিন উইলসন, দ্য অকাল্ট, (নিউ ইয়র্কঃ নডম হাউজ, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ৫১৪-১৫।

(৮০) আবু হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত সুনান আবু দাউদ, ইংলিশ ট্রান্সলেশন। ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১৩৯৫, হাদীস্ নং ৫০০১।

(৮১) মুসলিমদের মধ্যে মরমিবাদের যে উত্থান ঘটেছিল।

(৮২) এই ধরনের আসরগুলোতে আল্লাহর নামগুলো ক্রমাগত উচ্চারণ করা হয় এবং সংগীতের তালে তালে শরীর দোলানো হয়, এমনকি নাচাও হয়।

www.pathagar.com

মধ্যযুগীয় ইউরোপে জিন-ভূত তাড়ানোর শাস্ত্র[৮৩] বা ঝাড়ফুঁক ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। খ্রিষ্টানদের ঝাড়ফুঁকের রীতিগুলো এসেছে 'গসপেল' থেকে, যেখানে যিশু খ্রিষ্টের জিন তাড়ানোর বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণে আছে, একবার যিশু তার শিষ্যবর্গকে সাথে করে জেরাসিনস নামক স্থানে আসেন এবং জিনের আছরগ্রস্ত এক ব্যক্তির সন্ধান পান। যিশু তার উপর আছরকারী জিনদেরকে তার দেহ ছেড়ে চলে যেতে বললে তারা চলে যায়। এর পর তারা গিয়ে এক রাখালের শরীরে প্রবেশ করে, যে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের পাশে শূকরদের খাওয়াচ্ছিল। তারপর সে রাখাল হ্রদের খাড়া কিনারার দিকে ছুটে যায় এবং হ্রদে ডুবে যায়[৮৪]।

সত্তর এবং আশির দশকে ঝাড়ফুঁকের উপর বেশ কিছু ছবি নির্মিত হয়। যেমন 'দ্য এক্সরসিস্ট', 'রোজমেরি'জ বেবি' ইত্যাদি। বস্তুবাদী পশ্চিমাদের স্বভাব হলো অতিপ্রাকৃতিক যেকোনো কিছুকে চট করে অস্বীকার করে বসা। তাই, আধুনিক পশ্চিমাদের কাছে ঝাড়ফুঁকের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং তারা একে কুসংস্কার মনে করে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণ হলো, ইউরোপের অন্ধকার ও মধ্যযুগে ব্যাপকহারে জিনের আছরগ্রস্ত মানুষের উপর চিকিৎসার নামে নানা রকম অত্যাচার চলত, এমনকি পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটেছিলো। তবে, ইসলামে ঝাড়ফুঁক একটি বৈধ প্রক্রিয়া। এর দ্বারা সত্যিকারের জিনের আছরগ্রস্ত লোকদের অসুস্থতার চিকিৎসা করা হয়। তবে শর্ত হলো, ঝাড়ফুঁকের সে প্রক্রিয়া অবশ্যই কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে অনুমোদিত হতে হবে।

তিনটি উপায়ে আছরগ্রস্ত ব্যক্তিকে জিনের কবল থেকে মুক্ত করা যায়:

১. আছরকারী জিনের থেকেও শক্তিশালী কোনো জিনকে তলব করে তার সাহায্যে তাকে তাড়ানো। ইসলামে এই পদ্ধতি হারাম। কেননা অন্য জিনের দ্বারস্থ হতে গেলে প্রায়ই ইসলামি 'আকীদাহ-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নানারকম পাপাচারমূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। জাদুকর বা ওঝারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

---

(৮৩) আছরগ্রস্ত স্থান বা মানুষের উপর থেকে শয়তান আত্মা বা জিনকে তাড়ানো।

(৮৪) দেখুন ম্যাথিউ, ৮:২৮-৩৪, মার্ক ৫:১-২০ এবং লুক ৮:২৬-৩৯।

www.pathagar.com

২. জিনের সামনে নিকৃষ্ট শির্কি কর্মকাণ্ড করে তাকে দূর করা যায়। ওঝার শির্কি কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে জিন তখন দেহ ত্যাগ করে চলে যায়। এর দ্বারা সে ওঝাকে বুঝায় যে, তার শির্কি বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সব সঠিক। খ্রিষ্টান যাজকরা এভাবে ঝাড়ফুঁক করে থাকে। তারা যিশু এবং ক্রুশকে সাহায্যের জন্য ডাকে। পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা উঁচু মাপের ওঝা, তারাও মিথ্যা দেবতার নামে ঝাড়ফুঁক করে। ইসলামে এই পন্থার কোনো বৈধতা নেই।

৩. কুর'আন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে জিনকে তাড়ানো যায়। আসমানী কিতাবের শব্দ এবং কথামালা আছরগ্রস্ত ব্যক্তির চারপাশের গোটা আবহকেই বদলে দেয়। তবে এই পন্থা তেমন কার্যকর হবে না, যদি ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তির আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান না থাকে এবং নেক আমলের ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে তার ভালো সম্পর্ক না থাকে।

বর্তমানে পশ্চিমা বস্তুবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলিম মানুষের উপর জিনের আছর হওয়ার বিষয়টিকে একেবারেই অস্বীকার করে; এমনকি অনেকে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে জিনের অস্তিত্বই অবিশ্বাস করে। অথচ কুর'আন এবং সুন্নাহ বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। রসূল ﷺ থেকে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যেখানে আছরগ্রস্ত ব্যক্তির ঝাড়ফুঁকের বর্ণনা এসেছে। সাহাবারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক করেছেন এমন বর্ণনাও পাওয়া যায়।

ইয়া'আ ইব্ন মাররাহ বলেন,

"একবার আমরা রসূল ﷺ এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। পথিমধ্যে আমরা এক মহিলার দেখা পেলাম, সে তার বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে আছে। সে বলল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এই ছেলেটি বিপদগ্রস্ত এবং আমাদেরকেও সে ভয়ানক বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমি জানিনা দিনে সে কতবার জাদুগ্রস্ত হয়!' রসূল ﷺ বললেন, 'তাকে আমার হাতে দাও।' সে তার ছেলেকে তুলে রসূল ﷺ এর কাছে দিলে তিনি ছেলেটিকে তার সামনে ঘোড়ার পিঠের উপর বসালেন। তারপর তিনি ছেলেটির মুখ খুলে সেখানে তিনবার ফুঁ[৮৫] দিলেন এবং বললেন,

(৮৫) এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হলো نفخ নাফাখা, যার অর্থ হলো দুই ঠোঁটের মাঝে জিহ্বার

www.pathagar.com

'বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)! আমি আল্লাহর একজন বান্দা, দূর হয়ে যা, হে আল্লাহর শত্রু!' এরপর তিনি সে ছেলেটিকে মহিলার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফেরার পথে আমাদের সাথে দেখা করবে এবং কী হলো জানাবে।' আমরা চলে গেলাম এবং ফেরার পথে তিনটি ভেড়াসহ আমরা সে মহিলাকে ঐ স্থানেই দেখলাম। রসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছেলে এখন কেমন আছে?' সে উত্তর দিল, 'সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যাবার পর থেকে আমরা তার মধ্যে আর কোনো সমস্যা দেখিনি, তাই আমি আপনার জন্য এই ভেড়াগুলো নিয়ে এসেছি।' রসূল ﷺ আমাকে বললেন, '(উট থেকে) নামো এবং একটা ভেড়া নাও। বাকিগুলো তার কাছে ফিরিয়ে দাও'।"(৮৬)।

খারিজাহ ইব্ন আস-সালত থেকে বর্ণিত, তার চাচা বলেন,

"একবার আমরা রসূল ﷺ এর কাছ থেকে ফেরার সময় এক বেদুইন গোত্রের কাছ দিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বলল, 'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা সেই মানুষ রসূল ﷺ থেকে ভালো কিছু নিয়ে এসেছ। তোমাদের কি জিনের আছরগ্রস্ত লোকের জন্য ওষুধ কিংবা কোনো মন্ত্র জানা আছে?' আমরা উত্তর দিলাম 'হ্যাঁ', তো তারা জাদুগ্রস্ত এক পাগল ব্যক্তিকে নিয়ে এলো; আমি তার উপর তিনদিন ধরে সকাল-বিকাল সূরা ফাতিহাহ পড়লাম। প্রতিবার সূরা তিলাওয়াত শেষ করে আমি মুখে লালা জড়ো করলাম এবং থুতু দিলাম। শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল এবং তাকে দেখে মনে হলো, যেন সে বেঁধে রাখা অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে। বেদুইনরা তখন আমাকে এর বিনিময়ে উপহার এনে দিল। আমি তাদেরকে বললাম, 'আমি আল্লাহর রসূলকে না জিজ্ঞেস করে তোমাদের থেকে এই উপহার নিতে পারব না।' আমি যখন আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'তুমি উপহারটি গ্রহণ করো। আমার জীবনের কসম, যে কেউ মিথ্যা মন্ত্রের বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করে সে তার পাপের ভাগীদার হবে। কিন্তু তুমি যা পড়ে আয় করছ তা সত্য'।"(৮৭)

আগা রেখে ফুঁ দেওয়া। অর্থাৎ এটি হলো ফুৎকার (নাফাখা) এবং হালকা করে থু দেওয়ার মাঝামাঝি একটি ব্যাপার।

(৮৬) আহমাদ কর্তৃক সংগৃহীত।

(৮৭) সুনান আবু দাউদ, ইংরেজি অনুবাদ, ভলিউম ০৩, পৃষ্ঠা ১০৯২, হাদীস নং ৩৮৮৭।

www.pathagar.com

জিনে বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

সতর্ক ব্যক্তিত্ব

জিনজগতের ব্যাপারে ইসলামি জ্ঞান মানুষকে তাদের ফাঁদে পা দেওয়া থেকে সতর্ক করে। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া নানা 'অতিপ্রাকৃতিক এবং রহস্যময়' ঘটনার একটি ব্যাখ্যা বিশ্বাসীদের সামনে উন্মুক্ত করে, যা তাকে শির্কি বিশ্বাস এবং কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৩. কিতাবের উপরে বিশ্বাস

ক. কিতাবে বিশ্বাস বলতে বোঝানো হয়, মহান আল্লাহ ﷻ মানবজাতির কাছে কিতাব আকারে তাঁর যে বাণী প্রেরণ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আদম ﷺ এর সময় থেকে শুরু করে শেষ নাবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত আল্লাহ ﷻ মানবজাতির প্রতি অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কুর'আনে বিশেষভাবে কিছু কিতাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইব্রাহীম ﷺ এর উপর নাযিলকৃত কিতাব, মূসা ﷺ এর কাছে প্রেরিত তাওরাত, দাউদ ﷺ এর যাবূর এবং 'ঈসা ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ ইনজিল। সর্বশেষ মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট আল্লাহ ﷻ অবতীর্ণ করেন কুর'আন।

খ. কিতাবে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বিতীয় অর্থ হলো কুর'আনে উদ্ধৃত হোক কিংবা না হোক অন্য সকল নাবিদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কিন্তু এই কিতাবগুলো হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, নতুবা সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে; তাই এখন আর সেগুলোকে আল্লাহর কিতাব বলা যাবে না। ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের কাছে যে কিতাব আছে সেগুলোতে আল্লাহর অবতীর্ণ কথার কিছু অংশ হয়তো অবিকৃত আছে, কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই মানুষ বিকৃত করে ফেলেছে। যেহেতু এই কিতাবগুলোর মধ্যে কিছু অংশ এখনো আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী রয়েছে, তাই আল্লাহ ﷻ কুর'আনে এই কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে

www.pathagar.com

বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং মুসলিমদেরকে সে কিতাবগুলোর অবিকৃত বাণীর প্রতি বিশ্বাস করতে বলেছেন।

গ. কিতাবে বিশ্বাসের তৃতীয় বিষয় হলো, কুর'আনকে সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা। কুর'আন তার মূল অবস্থায় অবিকৃত ও সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং কুর'আনের প্রতিটি শব্দই আল্লাহর বাণী তা বিশ্বাস করা। আধুনিক ধর্মগ্রন্থ বিশেষজ্ঞরাও নিশ্চিত করেছেন যে, 'ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট' তার মূল রূপ থেকে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু আরবি যে 'কুর'আন' বর্তমানে পৃথিবিতে বিদ্যমান তা রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ যে কুর'আন শিখিয়েছিলেন হুবহু তার অনুরূপ।

মানবচরিত্রে আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের প্রভাব

একজন মু'মিন ব্যক্তি সবসময়ই আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও করুণার কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা মানুষের মনে তাঁর প্রতি ইতিবাচক ভাবের জন্ম দেয়। মু'মিন ব্যক্তির উচিত দুনিয়াতে তার সামান্য সাফল্য যেন তাকে আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল না করে দেয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। সুহায়েব ইব্ন সিনান ﷺ বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেন,

> *"মু'মিনের ব্যাপারটি আসলেই বিস্ময়কর। তার সব কিছুই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মু'মিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে (আল্লাহর) শোকর আদায় করে, আর যদি দুঃখ মুসিবত আসে তবে সে ধৈর্য ধারণ করে। অতএব প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।"*(৮৮)

তাছাড়া, একজন মু'মিন বিপদে-আপদে সবসময় এই ভেবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে যে, এই দুনিয়ায় অনেক মানুষ তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। রসূল ﷺ তাই বলেন,

---

(৮৮) সহীহ্ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৫৪১, হাদীস্ নং ৭১৩৮।

www.pathagar.com

"তোমরা যখন এমন কাউকে দেখো যাকে তোমাদের চেয়ে অধিক সম্পদ কিংবা সুন্দর দৈহিক গঠন দেওয়া হয়েছে, তবে সে যেন এমন কারো দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে।"(৮৯)

কৃতজ্ঞতাবোধ একজন মুসলিমের জীবনে চমৎকার এক ভারসাম্য এনে দেয়। এটি মানুষের মনে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়। কেননা সে মনে করে, ভালো যা কিছুরই সে অধিকারী হোক না কেন, তা আল্লাহর অনুগ্রহ। অপরদিকে, অকৃতজ্ঞতা মানুষকে ঠেলে দেয় অসৎ পথ, দুর্নীতি ও সীমালঙ্ঘনের দিকে। যখন মানুষ তার অর্জনের পেছনে আল্লাহর দয়ার কথা ভুলে যায় তখন সে ভাবে যে, সে নিজ ক্ষমতাবলেই তার কল্যাণ সাধন করেছে। তখন সে তার খেয়াল-খুশিমত সম্পদ ব্যয় করে এবং অপচয় করে। আল্লাহ ﷻ মু'মিনদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, **"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব; আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আযাব বড় কঠিন।"**(৯০)

মু'মিনদের কৃতজ্ঞতা কেবল আল্লাহর প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের প্রতিও তারা কৃতজ্ঞ। রসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে না।"(৯১)

এটি সত্য যে, মানুষ ভালো যা কিছু করে তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই করে। অতএব সকল কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ যার বা যাদের মাধ্যমে কল্যাণ দ্বারা বান্দাকে উপকৃত করেন, তারাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তাই তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়া হয়। ভালো কাজ যারা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে যদি উলটো তাদেরকে

---

(৮৯) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০৮, পৃষ্ঠা ৩২৮, হাদীস নং ৪৯৭ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৫৩০, হাদীস নং ৭০৭০।

(৯০) ইবরাহীম ১৪:৭।

(৯১) মুসনাদ আল ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা, আল মু'জামুল কাবীর ও সুনান আত-তিরমিযি।

www.pathagar.com

অবজ্ঞা করা হয়, কিংবা তার কাজের কোনো মূল্যায়ন না করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

৪. নাবি-রসূলে বিশ্বাস

ক. রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের মূল কথা হলো, একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ﷻ মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে তাঁর বিশেষ কিছু বান্দাকে মনোনীত করেছেন। তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তাদেরকে গোটা মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাদেরকে দিয়ে সকলের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

"তাদের সবাইকে আমি সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৯২]

আল্লাহর বিধি-বিধান কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা নাবি-রসূলগণ অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। তারা ডাকপিয়নের মতো নন, যার কাজ কেবল অন্যদের কাছে চিঠি বিলি করে বেড়ানো, চিঠির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

খ. নাবি-রসূলগণ যে আল্লাহর বিশেষ মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তা বিশ্বাস করার স্বাভাবিক দাবি হলো, তাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিকৃত সংস্করণে যেসব নোংরা কথাবার্তা রয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যেমন 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' নাবিদেরকে দেখানো হয় মাতাল[৯৩], অযাচারী[৯৪] ব্যভিচারী[৯৫], পতিতাবৃত্তির সমর্থক[৯৬], এবং মূর্তিপূজারী[৯৭] হিসেবে। নাবি-

(৯২) আল-আন'আম ৬:৮৬। আরও দেখুন আলি 'ইমরান ৩:৩৩।

(৯৩) নাবি নূহ ﷺ, জেনেসিস ৯:২১।

(৯৪) লূত ﷺ এর সাথে তার কন্যাদের [জেনেসিস ১৯:৩০], নাবি দাউদের পুত্র তার বোনের সাথে [২ স্যামুয়েল ১৩:১]।

(৯৫) জুদাহ এর সাথে তার পুত্রবধূ [জেনেসিস ৩৮:১৫] এবং দাউদ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে [২ স্যামুয়েল ১১:১]।

(৯৬) ঈশ্বর হোসিয়াকে বলেছেন যেন কোনো বেশ্যা স্ত্রীকে বেছে নেয়।

(৯৭) নাবি সুলাইমান মূর্তিপূজা করতেন [১ কিং ১১:৩]।

www.pathagar.com

রসূলদের প্রতি ঈমানের দাবি হলো, তাদের নামে এ ধরনের ঘৃণ্য মিথ্যাচার ও অবমাননার বিরোধিতা করা। তারা ছিলেন সৎপথ ও ন্যায়পরায়ণতার পথপ্রদর্শক। আল-কুর'আনে নাবি-রসূলদেরকে সমগ্র মানবজাতির নেতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের উপর আরোপিত সকল মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে একটি আলাপচারিতা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি কিয়ামাতের দিনে 'ঈসা ﷺ এর সাথে করবেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে,

"যখন আল্লাহ বলবেন, হে 'ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানাও? তিনি বলবেন: আপনি পবিত্র! আমার জন্যে এমন কথা বলা শোভা পায় না, যা বলার অধিকার আমার নেই। আমি তো তাদেরকে শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। আর তা হলো, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের সকলেরই পালনকর্তা।"

[আল-মা'ইদাহ, ৫:১১৬-১১৭]।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'ঈসা ﷺ এর উপর নিজের 'ইবাদাতের দিকে আহ্বানের অভিযোগ নাবিদের প্রতি ইহুদিদের পাপাচারের অভিযোগের চেয়েও মারাত্মক। কেননা, সবচেয়ে জঘন্য পাপ হলো আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করা। আখিরাতে আল্লাহ ﷻ সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু শির্কের গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ তাঁর সাথে শির্কের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। অন্য যেকোনো গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।" [আন-নিসা ৪:৮০]

গ. রসূলদের প্রতি বিশ্বাসের আরেকটি দিক হলো এ কথা মেনে নেওয়া যে, আল্লাহ ﷻ প্রত্যেক জাতির জন্য রসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আদম ﷺ এবং সর্বশেষ মুহাম্মদ ﷺ। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন,

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রসূল প্রেরণ করেছি।"

[আন-নাহ্‌ল ১৬:৩৬]

www.pathagar.com

কুর'আনে যাদের নাম উল্লেখ আছে এবং যাদের নেই—তাদের সকলের উপরই ঈমান আনতে হবে। তবে ওল্ড টেস্টামেন্টে যাদের নাম এসেছে, তাদের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয় যে, তারা নাবি ছিলেন কি না। কেননা এ কিতাবের মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে। মুসলিমরা বুদ্ধ কিংবা জোরোস্টারকে নাবি হিসেবে গ্রহণও করতে পারবে না, আবার তাদের নাবি হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকারও করতে পারবে না। হতে পারে মৃত্যুর পর তাদের আনীত বাণী বিকৃত করা হয়েছে। যেসব নাবিদের কথা উল্লেখ করা হয়নি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"আর নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি।" [গাফির, ৪০:৭৮]

ঘ. রসূলদের উপর ঈমান আনয়নের আরেকটি দিক হলো একথা স্বীকার করে নেওয়া যে, সকল নাবী-রসূলদের আনীত শিক্ষার মূলকথা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ, আল্লাহর মনোনীত দীন কেবল একটি। আল্লাহ ﷻ এক ও একক, মানবজাতি একটি সম্প্রদায় এবং জীবনব্যবস্থাও মাত্র একটি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর উপাসনা কর এবং তাগুতকে বর্জন করো।" [আন-নাহল ১৬:৩৬]

আল্লাহ ﷻ একেক জাতির জন্য একেক রকম বার্তা প্রেরণ করেননি। তিনি কাউকে চাঁদ-তারা, গ্রহ-নক্ষত্র, কাউকে গাছপালা, কাউকে জীবজন্তু কিংবা কাউকে মানুষের উপাসনা করতে, আর অন্যদেরকে তাঁর 'ইবাদাত করতে বলেছেন—এমন নয়। এ ধরনের বিশ্বাসই যত নষ্টের গোড়া। 'সব ধর্ম আল্লাহর থেকে এসেছে' এ ভ্রান্ত ধারণাই এমন সন্দেহের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই আল্লাহ ﷻ, যিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন। একমাত্র তিনিই 'ইবাদাতের যোগ্য—এটিই ছিল আল্লাহর সব নাবি-রসূলের আনীত শিক্ষার মূল কথা।

www.pathagar.com

নাবি-রসূলে বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

১) অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা

ক. ঈমানদারদের মন-মানসিকতা কখনোই এমন হবে না যে, তারা চোখ বন্ধ করে যেকোনো সামাজিক রেওয়াজ-প্রথা, হাল ফ্যাশন কিংবা নিছক লোকেরা করে বলে কোনো কিছুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেবে। ঐতিহ্য ও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান মানুষের কাছে অন্ধ-আনুগত্য দাবি করে। এগুলোর ভালো-মন্দ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় না। কেবল পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আগত বলেই এগুলো মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। অনেকে ভাবেন যে, পূর্বপুরুষদের আচার-অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করার অর্থ তাদের অপমান করা। সমাজ পূজারীরা বংশ পরম্পরায় চলে আসা আচার-প্রথা নিয়ে কোনো প্রশ্ন সহ্য করবে না। অপরদিকে, একজন মুসলিমের জন্য সকল প্রথাগত সামাজিক আচারব্যবস্থাকে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার করে দেখা অত্যাবশ্যক। যেগুলো কুর'আন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো তার কাছে গ্রহণযোগ্য, আর যেগুলো সাংঘর্ষিক সেগুলো প্রত্যাখ্যাত।

খ. মুসলিমরা কোনো ব্যক্তিরই অন্ধ অনুসরণ করবে না; তিনি যতোই ধার্মিক হোন না কেন। সব মানুষই ভুল করতে পারে। পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন সকল ভুল থেকে কেবল নাবি-রসূলদেরকেই ওয়াহ্‌য়ির সাহায্যে রক্ষা করা হয়েছে। এ কারণেই তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য আল্লাহর উপর ঈমানের একটি অপরিহার্য বিষয়। যারা নিজ অনুসারীদেরকে অন্যায়ভাবে বশীভূত করে রাখতে চায়, তারা নানা আজগুবি কাহিনি রচনা করে বেড়ায়। এসব গল্প-কাহিনিতে সাধারণত তাদেরকে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়। যেমন, ইসনা আশারিয়া শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, নাবি ﷺ এর জামাতাসহ তাদের বার ইমামের প্রত্যেকে অকাট্য, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। আগা খানের অনুসারী ইসমাঈলি শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, আগা খান হলো মানুষের রূপ ধারণকারী আল্লাহ।

গ. মুসলিমরা ফ্যাশন-ভূষণের দাস নয়। নিছক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, ফ্যাশনেবল হতে পারাটা কখনোই তাদের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে

www.pathagar.com

না। মু'মিন ব্যক্তি স্রোতের টানে চলে না যে, সবাই ভালো হলে সেও ভালো, আর সবাই খারাপ হলে সেও খারাপ হয়ে যাবে।

একজন মুসলিম সময়ের সাথে তাল মেলানোর জন্য প্রত্যেক শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্তে হাল ফ্যাশনের নতুন কাপড়ের পিছে ছোটে না। এটা নিছক বিলাসিতা। ট্রেন্ড নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আল্লাহ ﷻ বিলাসিতার ব্যাপারে তাঁর অপছন্দের কথা কুর'আনে ব্যক্ত করেছেন,

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" [আল-ইসরা, ১৭:২৭]

শুধু ক্রেইজ ধরে রাখার জন্য মুসলিমরা কোনো পোষাক নিয়ে মাতামাতি করবে না। যে পোষাক ইসলামসম্মত না, মুসলিমরা তা অবশ্যই এড়িয়ে চলবে। অন্যথায়, ফ্যাশন বা 'সমাজের সুন্নাহ' একজন মুসলিমের কাছে রসূলের সুন্নাহর চাইতেও বেশি প্রিয় হয়ে যাবে। যখন কোনো ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন সে ঈমানী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যায়। ইব্ন 'উমার ﷺ এর বর্ণনায় নাবি ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই একজন হিসেবে গণ্য হবে।"[৯৮]

২. একনিষ্ঠ আনুগত্য

নাবি-রসূলে বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে মজবুত করে। তাদেরকে একারণে মেনে চলতে হবে যে, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে প্রেরণ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলিমদের মাঝে এ চিন্তা তৈরি করার মাধ্যমে ঈমানের এ স্তম্ভটি মুসলিমদের অন্তরে সৃষ্টিকর্তাকে মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

৩. কৃতজ্ঞতাবোধ

কিতাবে বিশ্বাসের মতোই, নাবি-রসূলে বিশ্বাসও প্রকৃত ঈমানদারদের মাঝে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। আল্লাহ ﷻ ইচ্ছে করলে কোনো নাবি-রসূল প্রেরণ না করে অলৌকিকভাবে কিতাব নাযিল করতে

(৯৮) আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত এবং সহীহ্ আল-জামি'ই আস-সাগীরে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত, ভলিউম ০২, হাদীস্ নং ৬১৪৯।

www.pathagar.com

পারতেন। তাছাড়া প্রতিটি মানুষকে ভালো ও মন্দ বোঝার যে স্বভাবজাত বোধ দেওয়া হয়েছে তা-ই যথেষ্ট ছিলো। সব কিছুর ঊর্ধ্বে এই গ্রন্থগুলি মানুষের জন্য আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ। তবে, কেউ যেন একথা না বলতে পারে যে, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব নয়; কিংবা কেউ যেন খেয়াল-খুশি মতো আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু না করে, সেজন্য কিতাবের সাথে আল্লাহ ﷻ নাবি-রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। তারা হাতে কলমে মানুষকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দেন। আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নাবি-রসূল প্রেরণ আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এর জন্য মানুষের উচিত আল্লাহ ﷻ রব্বুল আলামীনের প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকা।

৫. পরকালে বিশ্বাস

ক. পরকালে বিশ্বাসের প্রথম অর্থ হচ্ছে এটা বিশ্বাস করা যে, এই দুনিয়ার একটি শেষ আছে এবং এরপর সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। কেউ মারা গেলে আর এ জীবনে ফিরে আসে না। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাঝে যে সময়টা অন্তরায় হিসেবে থাকে তাকে বলা হয় 'বারযাখ'। পুনরুত্থানের নির্ধারিত সময় হলে আল্লাহ ﷻ আদেশ দেবেন, যেন সেই অণু-পরমাণুগুলো পুনরায় তাদের আত্মার সাথে মিলিত হয়, যেগুলো দিয়ে প্রথমবার মানবদেহ তৈরি হয়েছিল। এরপর মানুষ নতুন করে আবার জীবিত হবে। ইসলামের এই পরকালে বিশ্বাস পৌত্তলিকদের পুনর্জন্মে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

খ. পরকালের প্রতি ঈমান আনার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, শেষ বিচারে বিশ্বাস করা। এ পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে, আল্লাহ ﷻ সেদিন তাদের সকলেরই বিচার করবেন। তাদের গোটা জীবনকে পর্যালোচনা করা হবে, তাদের আমলগুলো পরিমাপ করা হবে। সেদিন, আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ ﷻ চাইলে তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্টির পরই জান্নাতীদেরকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কারণ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি জানতেন,

www.pathagar.com

কে কোন পথ বেছে নেবে, কাকে কী সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে, কে ঈমান সহকারে আর কে কুফরির উপর মৃত্যুবরণ করবে।

এভাবে চিন্তা করলে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, কিছু মানুষকে জান্নাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর অন্যদের জাহান্নামের জন্য। 'আঁ'ইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ ﷻ তা'আলা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর তিনি এই জান্নাতের এবং জাহান্নামের উপযুক্ত অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন।"(৯৯)

যাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদেরকে যদি তিনি সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন, তারা তাঁর সিদ্ধান্তে আপত্তি তুলতো না। তারা খুশিমনেই এই চিরস্থায়ী সুখের জীবনকে বরণ করে নিত এবং তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হয়নি ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করতো। কিন্তু, এভাবে যাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হতো তারা নিশ্চয়ই এর কারণ জিজ্ঞেস করতো। তাদের মনে হতো, তাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে। কেননা কোন অপরাধে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে তা তো তারা জানে না। জাহান্নামীরা তর্ক করতেই থাকত যে, তাদেরকে যদি দুনিয়াতে পাঠানো হতো, তাহলে তারা ঈমান আনতো এবং সৎ কাজ করতো। কাজেই, আল্লাহ ﷻ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং ভালো-মন্দ যে কোনো পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এর দ্বারা জাহান্নামীরা বুঝতে পারবে যে, তারা নিজেরাই জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে। তারা তাদের জীবনে আল্লাহর দয়া উপলব্ধি করতে পারবে; আর তাঁর নিদর্শনাবলী ও হেদায়েতকে অস্বীকার করে যে পাপ তারা করেছে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। তাঁর বিচারকে ন্যায্য ও অনুযোগের ঊর্ধ্বে বলে মেনে না নিয়ে তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই তখন আল্লাহর সাথে বাদানুবাদের বদলে, তারা কেবল আরেকটি সুযোগ ভিক্ষা চাইতে থাকবে, যেন আবার এ জীবনে ফিরে এসে ভালো

(৯৯) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪০০, হাদীস নং ৬৪৩৫।

www.pathagar.com

কাজ করতে পারে; এ কথাই আল্লাহ ﷻ ব্যক্ত করেছেন কুর'আনের সূরাহ আস-সাজদাহ্‌তে:

"যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। আমাদেরকে (একটিবার) ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা অবশ্যই সৎকর্ম করব। সত্যিই, আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি'।" [আস-সাজদাহ, ৩২:১২]

তবে, আল্লাহ ﷻ যদি তাদের দেখা জাহান্নামের স্মৃতি মুছে তাদেরকে পুনরায় এ দুনিয়াতে পাঠাতেন, তাহলে তারা আবারো সেই মন্দ পথই বেছে নিতো; আর আগের মতো জাহান্নামে গিয়েই পৌঁছতো। সূরা আল-আনআমে আল্লাহ ﷻ এ ব্যাপারে বলেছেন,

"আর যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়, তবুও তারা তা-ই করতো, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।"

[আল-আন'আম ৬:২৮]

গ. পরকালে বিশ্বাসের আরেকটি দিক হলো জান্নাত বা জাহান্নামে বিশ্বাস করা। যাদের নেক 'আমলের পরিমাণ বেশি হবে, তাদের পাঠানো হবে জান্নাতে; আর যাদের মন্দ কাজের পরিমাণ বেশি হবে, তাদেরকে পাঠানো হবে জাহান্নামে। তবে মনে রাখতে হবে যে, শুধু আমল দিয়ে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না। নেক 'আমল এবং আল্লাহর রাহমাহ—এ দুটো জিনিসের কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণিত আছে যে নাবি ﷺ বলেছেন,

"তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং সম্ভব না হলে যথাসাধ্য চেষ্টা করো। মনে রাখবে, তোমাদের কেউ শুধু আমলের দ্বারা নাজাত লাভ করতে পারবে না। সহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও না?' তিনি বললেন, 'না, আমিও না। তবে আল্লাহ ﷻ যদি নিজ রাহমাত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।(১০০) এবং তোমরা জেনে রাখো, যে আমল নিয়মিত করা হয় সেটাই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, পরিমাণে তা যতোই কম হোক না কেন'।"(১০১)

---

(১০০) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪৭৩, হাদীস নং ৬৭৬৫, আবু হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত।

(১০১) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৪৭৩-৪, হাদীস নং ৬৭৭০, 'আ'ইশাহ কর্তৃক

www.pathagar.com

তবে, মহান আল্লাহর করুণা মোটেই মানুষের মতো আবেগ-নির্ভর বা অযৌক্তিক নয়, বরং তা মানুষের বিশুদ্ধ ঈমান এবং সৎকর্মের উপর নির্ভর করে। আর মানুষের নেক 'আমলের বিনিময়ও আল্লাহ ﷻ দশ গুণ বাড়িয়ে দেবেন। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

"যে একটি ভালো কাজ করবে, সে তার দশ গুণ পাবে; কিন্তু যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে কেবল তার সমপরিমাণ শাস্তিই পাবে। তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।" [আল-আন'আম, ৬:১৬০]

আল্লাহ ﷻ যদি মানুষের বিচারে কঠোরতা দেখাতেন, তাহলে কারো ভালো কাজের ওজনই মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হতো না। কিন্তু ভালো কাজের মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে আল্লাহ ﷻ মানুষের উপর এক অপার অনুগ্রহ করেছেন। রসূল ﷺ আরও বলেছেন,

"আল্লাহ ﷻ নেকী ও বদীসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছা করল, কিন্তু তা করল না, আল্লাহ ﷻ তাকে তার পূর্ণ নেকী দান করবেন। আর যে ব্যক্তি ভাল কাজের নিয়ত করলো এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ ﷻ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত, এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ ﷻ তার জন্যও পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ ﷻ মাত্র একটা পাপ লিখে রাখেন।"[১০২]

কাজেই, একমাত্র আল্লাহর দয়া ও করুণাতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'আমল যদিও একটি বড় ভূমিকা পালন করে, যেহেতু আল্লাহর রাহমাত 'আমলের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এটিই একমাত্র মীমাংসাকারী বিষয় নয়। আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ এসব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। অতএব, মানবজাতির সৃষ্টি, তাদের ভালো কাজ, মন্দ কাজ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহর

বর্ণিত।

(১০২) সহীহ আল-বুখারি, ভলিউম ০৮, পৃষ্ঠা ৩২৯, হাদীস নং ৪৯৮ এবং সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০১, পৃষ্ঠা ৭৫-৬, হাদীস নং ২৩৭।

www.pathagar.com

অনন্য গুণাবলিসমূহ প্রকাশ পায়। তাঁর দয়া ও ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার, রহমত ও অনুকম্পা প্রকাশিত হয়।

যেসব মানুষের মন্দ কাজের পাল্লা ভারি হবে, তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। তবে, সে যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে তাকে পাপের শাস্তি ভোগের পর জাহান্নামের আগুন থেকে এনে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যারা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর নাবি-রসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা অনন্তকাল জাহান্নামেই রয়ে যাবে।

পরকালে বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

১. বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব

যারা মৃত্যুর পরের জীবন, পুনরুত্থান ও শেষ বিচারে বিশ্বাস করে, তাদেরকে অবশ্যই নিজ কাজ-কর্মের পরিণাম মনোযোগের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শেষ দিবসে বিশ্বাস মানুষকে নগদ লাভের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, তাদেরকে বৃহৎ পরিসরে চিন্তা করতে শেখায়। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের বাইরে গন্তব্য নির্ধারণ করতে শেখায়। এ কারণে, রসূল ﷺ প্রায়ই আখিরাতে বিশ্বাসের কথা বলার সময় সৎকাজের কথা বলতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিদের আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।"

২. দৃঢ় ও আপসহীন ব্যক্তিত্ব

শেষ বিচারে বিশ্বাসীগণ দুনিয়ার কোনো লাভের কারণে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে আপস করবে না। তারা হবে নীতিবান, নিজের বিশ্বাস ও কাজে অটল, তাতে তাদেরকে যতো সমস্যারই মুখোমুখি হতে হোক না কেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

www.pathagar.com

"হে নাবি, বলে দিন, মন্দ আর ভালো কখনো সমান হতে পারে না, যদিও মন্দের আধিক্য আপনাকে বিস্মিত করে।"(১০৩) [আল-মাইদাহ, ৫:১০০]

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের ভালো মানুষী ততোক্ষণই টিকে যতোক্ষণ তা সুবিধাজনক হয়। কিন্তু যখনই সমাজ খারাপ হয়ে যায়, লোকেরা চুরি ডাকাতি করে, ঠকবাজি করে, কিংবা সৎ থাকতে গেলে তাদেরকে যদি বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়; তখন তারা কোনো রকম একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাদের নীতি বিসর্জন দিয়ে দেয়।

৩. আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস মুসলিমদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করে যে, খারাপ লোকদেরকে এ জীবনে যত সফলই দেখাক না কেন, বাস্তব অর্থে তারা সম্পূর্ণই ব্যর্থ। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে, আল্লাহর দ্বারা কেবল তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান এবং তাদের প্রাণ বের হবে কাফির অবস্থায়।"(১০৪) [আত-তাওবাহ, ৯:৫৫]

যাদের আখিরাতে বিশ্বাস নেই, তারা সহজেই মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে; কেননা মন্দের উপর ভালোর যে চূড়ান্ত বিজয় হবে সে ব্যাপারে তাদের কোনো আস্থা নেই। তারা হয়তো ভালোর জন্য ভালো কাজ কেবল ততোদিনই করবে, যতোদিন তারা বৈষয়িক সাফল্য পাবে। কিন্তু ভালো কাজ করা সত্ত্বেও যখন ব্যর্থতা আসবে, দুর্নীতিবাজের দল সফল হতে থাকবে, তারা সাথে সাথে প্রশ্ন করে বসবে, 'এসবের কোনো মানে আছে?' বা 'কী দরকার এত ভালো সাজার?'

(১০৩) আল-মা'ইদাহ, ৫:১০০।

(১০৪) আত-তাওবাহ, ৯:৫৫।

www.pathagar.com

৬. তাকদীর বা ভাগ্যের ভালো-মন্দে বিশ্বাস

কদর তথা ভাগ্যের ভালো-মন্দে বিশ্বাস ঈমানের ষষ্ঠ স্তম্ভ। ফেরেশতা জিবরীল ﷺ এর ঈমান বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে নাবি ﷺ এ ভাগ্যের কথাই বলেছিলেন। ভাগ্যে বিশ্বাস ঈমানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে, প্রাচীনকাল থেকেই অধিকাংশ লোকেরা ভাগ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে চলছে। এমনকি নাবি ﷺ এর আমলেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছে; আর আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামি শিক্ষায় ভাগ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এতোটাই স্পষ্ট যে, এখানে কোনো রকম বাদানুবাদ করা বা ধুম্রজাল সৃষ্টির সুযোগ নেই। কদরে বিশ্বাসের অর্থ সবকিছু আল্লাহ ﷻ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত তা স্বীকার করে নেওয়া। আল্লাহ ﷻ কুর'আনের সূরাহ আল-কামারে বলেছেন: **"নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।"** (৫৪:৪৯)।

এর অর্থ হলো, আল্লাহ ﷻ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিমাপ আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন বা এর ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁর সে প্রজ্ঞা অনুযায়ীই প্রতিটি সৃষ্টির নিয়তি নির্ধারণ করেন, যে মহান প্রজ্ঞার ভিত্তিতে তিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, যে কল্যাণ কামনা করেন, তার সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি কদর নির্ধারণ করেন।

ভাগ্যে বিশ্বাস প্রধানত চারটি মূলনীতির উপর অবস্থিত:

ক) 'ইল্‌ম বা জ্ঞান

এ মূলনীতির দাবি হলো পরিপূর্ণভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়। হোক এ জ্ঞান আল্লাহর কিংবা তাঁর সৃষ্ট জীবের কার্যাবলি সম্বন্ধীয়। আল্লাহর কাছে তা একই ব্যাপার। ইতিহাসের পাতায় কী লেখা হবে সেগুলোর সারসংক্ষেপ বা রূপরেখার মাঝে তাঁর জ্ঞান সীমিত নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলিসমূহ অসীম। এগুলোর না আছে শুরু, না আছে শেষ। আর

www.pathagar.com

তাই, আল্লাহর জ্ঞানেরও কোনো সীমারেখা নেই। এই সীমাহীন জ্ঞানের কথা কুর'আনের অনেক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ ﷻ সূরা আলি 'ইমরানে বলেছেন:

"জমিনে কিংবা আসমানে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না"
[আলি 'ইমরান, ৩:৫]

সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর অজানা কিছুই নেই। মানুষ এবং মানুষকে ঘিরে চারপাশের এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী, সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ করে। সূরাহ আল-আন'আমে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না..." [আল-আন'আম, ৬:৫৯]

ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট জীবেরা যা অনুভব করতে অপারগ, তা সবই আল্লাহর জানা। আল্লাহ ﷻ কোনো বিষয়ে জানেন না এ দাবি করার মানে হলো, আল্লাহ ﷻ সব জানেন এই মূলনীতিকে অস্বীকার করা। আর এটা হলো আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা। এর মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকেও অস্বীকার করা হয়। কেননা জ্ঞানের বিপরীত হলো মূর্খতা কিংবা বিস্মৃতি, যা কখনোই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

যখন ফেরাউন নাবি মূসা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলো,
"হে মূসা, তাহলে কে তোমাদের রব?" [আত-ত্বা-হা, ২০:৪৯]

তিনি উত্তরে বলেন,
"আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথনির্দেশ দান করেছেন।" [আত-ত্বা-হা, ২০:৫০]

ফেরাউন এরপর জানতে চাইলো:
'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?' [আত-ত্বা-হা, ২০:৫২]

মূসা ﷺ এর জবাব ছিলো:
"এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না।" [আত-ত্বা-হা, ২০:৫২]

www.pathagar.com

রবের নিকট পূর্ববর্তী যুগের জ্ঞান আছে; এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ﷻ অতীতের সব খবর জানেন। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের ব্যাপারে যদি অজ্ঞতা থাকে কিংবা যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে তার দ্বারা ভুল হতে পারে। তাই, নাবি মূসা ﷺ আল্লাহর অসীম জ্ঞানের কথা সুনিশ্চিত করেছেন।

খ) লিখনী

এ নীতিতে বিশ্বাসের মূল কথা হলো, কিয়ামাত পর্যন্ত এবং কিয়ামাত ছাড়িয়ে, যা কিছুই জীবিত আছে, ছিল এবং থাকবে তার সবকিছুর ভাগ্য আল্লাহ ﷻ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। নাবি ﷺ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ ﷻ কলম সৃষ্টি করলেন, তিনি একে লিখতে বললেন, আর তখন কলম জিজ্ঞেস করলো, কী লিখব? আল্লাহ ﷻ তাকে যা ছিল এবং যা ঘটবে সব কিছু লিখে ফেলতে বলেন। কোনো সাধারণ বিবৃতি নয়, বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করা হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে নিচের আয়াতে:

"তুমি কি জানো না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ ﷻ তা জানেন! নিশ্চয়ই তা একটি কিতাবে রয়েছে। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"

[আল-হাজ্জ, ২২:৭০]

মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বয়স চার মাস হয়ে গেলে, চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়: শিশুটি কত দিন বাঁচবে, জীবনে কী সুযোগ-সুবিধা (রিযিক) পাবে, তার আমল, এবং সে হতভাগ্য হবে নাকি সৌভাগ্যবান[১০৫]। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কদর এর রাতে পরবর্তী বছরের আমলনামা বা ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়, যার কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে:

"নিশ্চয়ই আমি কুর'আন নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

[আদ-দুখান, ৪৪:৩-৪]

(১০৫) সহীহ মুসলিম, ৪:১৩৯১, হাদীস নং ৬৩৯০।

www.pathagar.com

গ) আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত

সৃষ্টির মাঝে যা কিছুই ঘটে, সব আল্লাহর দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হয়। হোক তা স্বয়ং আল্লাহর বা মানুষের কোনো কাজের পরিণতি। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন:

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ ﷻ যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মানিত করার মতো কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।"

[আল-হাজ্জ, ২২:১৮]

তিনি আরও বলেন,

"আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।" [আন-নাহল ১৬:৯]

তিনি আরও বলেন:

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না।"

[আত-তাগাবুন ৬৪:১১]

ইব্‌ন 'আব্বাস ﷺ বলেন, 'অনুমতি' কথাটি এখানে 'আদেশ' বোঝাচ্ছে। এই আয়াত এবং অন্যান্য আরও আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ ﷻ যা-ই করেন তা তাঁর নিজের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এমন আরও কিছু আয়াত রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে তাঁর সৃষ্টির কর্মকাণ্ড তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়; উদাহরণস্বরূপ:

"এটা তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ﷻ ইচ্ছা করেন।" [আত-তাকউঈর, ৮১:২৭-২৯]

www.pathagar.com

এই আয়াতটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহর সৃষ্টির কার্যাবলি আল্লাহর ইচ্ছে অনুসারে পরিচালিত হয়। যদি আল্লাহ ﷻ চাইতেন যে, তারা কোনো কাজ না করুক, তাহলে তা কখনোই সংঘটিত হতো না।

ঘ) আল্লাহ ﷻ সবকিছুর স্রষ্টা

তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই সৃষ্ট। সৃষ্টিজগৎ হলো আল্লাহর সৃষ্টি, আর সৃষ্ট জীবেরা যা কিছুই তৈরি করে তা-ও আল্লাহর সৃষ্টিরই অংশ; হোক সেটি কোনো কথা বা কাজ। তারা সবাই আল্লাহর সৃষ্টির অংশ, কারণ মানবজাতির কথা বা কাজ তাদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং একজন মানুষ যদি সৃষ্ট হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার বৈশিষ্ট্যগুলোকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

'আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু করো তা সৃষ্টি করেছেন।

[আস্-সাফফাত, ৩৭:৯৬]

আল্লাহ ﷻ এখানে মানুষ এবং তাদের আমল সৃষ্টির ব্যাপারে কথা বলছেন। 'আলিমগণ এ আয়াতের ما শব্দটির অর্থ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন: এটা কি ما مصدرية? যার অর্থ দাঁড়াবে: 'আল্লাহ ﷻ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকে সৃষ্টি করেছেন', নাকি এটা ما موصولة? তাহলে আয়াতটির অর্থ হবে 'আল্লাহ ﷻ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো।' যে অর্থেই নেওয়া হোক, উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ﷻ মানুষের কাজকে সৃষ্টি করেছেন।

এই চারটি মূলনীতি তাকদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে। আর এ বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না এর প্রত্যেকটি শাখায় বিশ্বাস স্থাপন করা হচ্ছে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভাগ্যে বিশ্বাসের সাথে বাস্তব জগতের কার্যকারণ সূত্র cause and effect-এর কোনো সংঘর্ষ নেই। বরং খোদ কার্যকারণ প্রক্রিয়াই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ

www.pathagar.com

ﷺ আমাদেরকে কিছু কাজের আদেশ দিয়েছেন। তিনি চান আমরা যেন সে কাজগুলো করি। বিশ্বজগৎ পরিচালনায় আল্লাহর যে প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে, এই কাজগুলো সে নীতির মধ্য থেকেই একটি স্বাভাবিক ফলাফল বয়ে আনবে।

এ ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা কেমন হবে তা স্পষ্ট হয়ে যায় খলীফাহ 'উমার ﷺ একটি ঘটনা থেকে। তিনি একবার সিরিয়া যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তাকে খবর দেওয়া হলো যে, সেখানে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবেন নাকি মাদীনায় ফিরে যাবেন। তারা মাদীনায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হলেন।

এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, খলীফাহ 'উমার ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কীভাবে মাদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি থেকে পালাতে চান?' 'উমার ﷺ উত্তর দিলেন, 'আমরা আল্লাহর এক নিয়তি থেকে পালিয়ে তাঁর আরেক নিয়তির দিকেই যাচ্ছি।'

এর পরে, 'আব্দুর-রহমান ইব্ন 'আওফ ﷺ এসে যখন এ ঘটনা শুনলেন, তখন তিনি নাবি ﷺ এর একটি হাদীস্ বর্ণনা করলেন। যে হাদীসে তিনি বলেন, 'তোমরা যদি শোনো কোনো এলাকায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে প্রবেশ করবে না।'

নিয়তি থেকে পালানো সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে 'উমার ﷺ এর উত্তর এটাই প্রমাণ করে যে, কারণ এবং পরিণতির উপর ভিত্তি করে 'আমল করাও আল্লাহর কদরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ভালো করেই জানি যে, বিয়ে না করেই যদি কেউ বলে, 'আমার একটা বাচ্চা হবে', তাহলে তাকে সবাই পাগল বলবে। একইভাবে, যদি কেউ বলে, 'আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি', কিন্তু সে যদি জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো চেষ্টাই না করে, তাহলে তাকে বলা হবে অপরিণামদর্শী মূর্খ।

আল্লাহর শারী'আহ্তে নৈতিকতা সংক্রান্ত যেসব আইন আছে কিংবা প্রাকৃতিক বিশ্বে যে সব কার্যকারণ সূত্র আছে, কদরে বিশ্বাস তার কোনোটাকেই

www.pathagar.com

অস্বীকার করে না। যে সকল কাল্পনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে কদরে বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করা হয় সেগুলো সত্যিই কাল্পনিক। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমরা এখানে বলছি বাস্তব জগতের সেইসব বস্তুগত কারণ এবং ফলাফলের কথা, যেগুলো সত্য এবং বাস্তব। কল্পনা ও মিথ্যার উপর ভিত্তি করে কোনো তত্ত্ব দাঁড় করানো যায় না। সত্যি বলতে এগুলো কোনো সমস্যাই না; অথচ লোকেরা সাধারণত এগুলো নিয়েই গোল বাঁধানোর চেষ্টা করে। যেমন অনেকে বলে, 'যদি আমার আমল আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে, তাহলে আমি কেন আমার গুনাহর কারণে শাস্তি পাবো?'

"অচিরেই মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ ﷻ যদি চাইতেন, আমরা শির্ক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না।' এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বলো, 'তোমাদের কাছে কি এমন কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ'।" [আল-আন'আম ৬:১৪৮]

এর জবাব হলো এই যে, কেউ ভাগ্যকে আল্লাহর অবাধ্যতা করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ কাউকেই গুনাহ করার জন্য বাধ্য করেননি। যখন আপনি কোনো গুনাহ করতে যাচ্ছেন, তখনও কিন্তু আপনি জানেন না যে, সেটি আপনার জন্য পূর্বনির্ধারিত। তাহলে আপনি কেন ভাবলেন না যে, আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য আনুগত্য ও ন্যায়পরায়ণতা নির্ধারণ করে রেখেছেন? আর কেনই বা গুনাহর বদলে সেগুলোর জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করলেন না?

বৈষয়িক ব্যাপারে তো আপনি আপনার নিকট যা ভালো এবং সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়, সেটা অর্জন করার জন্য সব কিছু করে থাকেন। কেন আপনি এই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন, পরকাল নিয়ে সেভাবে লাগেন না?

যদি কেউ আপনাকে বলে মক্কায় যাওয়ার দুটো পথ আছে; একটি নিরাপদ, আরামদায়ক ও সহজ এবং অপরটি কঠিন ও বিপদজনক, তাহলে

www.pathagar.com

কি আপনি ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন রাস্তাটি ধরে বলবেন, 'এটাই আল্লাহ ﷻ আমার জন্য নির্ধারিত করেছেন?'

এই ব্যাপারটি ঠিক এমনই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। যখন বলা হয় জান্নাতে যাওয়ার পথ একটি; আর জাহান্নামে যাওয়ার অন্যটি। এখন আপনি যদি জাহান্নামের পথ ধরেন, তাহলে আপনি হলেন তার মতো, যে কঠিন এবং বিপদজনক পথটি বেছে নেয়। তাহলে কেন আপনি এ দাবি করবেন যে, আপনার এই পথ বেছে নেয়াটা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি?

এমনকি মানুষ যদি তাদের অবাধ্য আচরণ ও ভাগ্যের ব্যাপারে শুধু তর্কের জন্যই তর্ক করতে থাকে, তবে তা-ও ধোপে টিকবে না। আল্লাহ ﷻ সবরকম তর্কের অবসান ঘটাতে নাবি-রসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন এভাবে:

"আর (পাঠিয়েছি) রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রসূলদের পর মানুষের জন্য কোনো অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [আন-নিসা, ৪:১৬৫]

কদরে বিশ্বাস মানুষের জীবনে এক চমৎকার ফল বয়ে আনে। যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলে, মানুষ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানায়, সে এমন বিশ্বাস করে না যে, ভালো যা কিছু হয়েছে তা সবই তার নিজ কাজের ফলাফল। সে তার শক্তি, বুদ্ধিমত্তা কিংবা দক্ষতা নিয়ে অহংকার করবে না; সে ভুলে যাবে না যে, এগুলো সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। তেমনিভাবে, নৈতিক বিচারে, যদি কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ করে, সে নিজের সাধুতায় মুগ্ধ হয়ে যাবে না। সে মনে করবে যে, আল্লাহ ﷻ তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং এ কাজ করার সামর্থ্য দিয়েছেন বলেই সে তা করতে পেরেছে। এ চিন্তা মানুষকে এমন ভাবনা থেকে বিরত রাখে যে, সে ভালো কাজ করে যেন আল্লাহর উপর খুব অনুগ্রহ করে ফেলছে। আল্লাহ ﷻ কুর'আনে বলেছেন: **"তুমি যে কল্যাণ লাভ করো, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে..."**

[আন-নিসা, ৪:৭৯]

একইভাবে, ভাগ্যে বিশ্বাস মানুষকে বিপদ-আপদে সাহস যোগায়, হতাশা থেকে সুরক্ষা দেয়। কী হতে পারতো তা ভেবে হা-হুতাশ, আফসোস, নিজের

www.pathagar.com

উপর অবিচার ইত্যাদি করে সময় ও শক্তি অপচয় করা থেকে বিরত রাখে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"জেনে রাখো, যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ ﷻ তা তোমার জন্য লিখে রাখেন; আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য তা লিখে না রাখেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পাতা শুকিয়ে গেছে।"[১০৬]

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন,

"জেনে রাখো, যা তোমার সাথে হয়েছে তা কোনোভাবেই এড়ানো যেতো না এবং যা তোমার সাথে হয়নি তা কোনোদিনও তোমার সাথে হওয়ার কথা ছিল না।" তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেকটি কল্যাণকর কাজে তুমি অগ্রগামী হও; এ ব্যাপারে কখনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। কখনো ভাববে না যে, যদি আমি এমন করতাম তবে এমন হতো না। বরং এই বল যে, আল্লাহ ﷻ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, তোমার 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।"[১০৭]

এর বিপরীত চিত্রে, যে ব্যক্তি কদরে বিশ্বাস করে না, সে ভালো কিছু লাভ করলে অভিভূত হয়ে পড়বে ও অহংকার করবে; আর যখন তার ওপর বিপদ-আপদ আসে, সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। কদরে বিশ্বাস এসব থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষিত রাখে।

---

(১০৬) আত-তিরমিযি কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন আন-নাওয়াউইর চল্লিশ হাদীস, পৃষ্ঠা ৬৮।
(১০৭) সহীহ মুসলিম, ৪:১৪০১, হাদীস নং ৬৪৪১।

www.pathagar.com

তাকদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে

১. ধৈর্যশীল ব্যক্তিত্ব

যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহর আদেশে, এ কথা জানা থাকলে একজন ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন সময়ও ধৈর্য ধারণ করতে পারবে। যখন কোনো কিছুই আর পরিকল্পনামাফিক হয় না, ঈমানদার ব্যক্তি মেনে নেয় যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় এ ব্যাপারটি ঘটতে দেননি বলেই তা হয়নি; হতে পারে কাজটি কল্যাণকর নয়। এমন বহু ঘটনা সমাজে ঘটে, যেখানে চাকরি বা সম্পদ খোয়ানোর ফলে লোকেরা এমন হতাশ প্রতিক্রিয়া[১০৮] দেখিয়েছে যে, তাদেরকে মানসিক চাপ মোকাবেলা করা শেখাতে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে।

পবিত্র কুর'আনে এই বিষয়টি আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন,

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"

[আল-বাক্বারাহ, ২:১৫৫]

২. পরিতৃপ্ত ব্যক্তিত্ব

মানুষ যত পরিমাণ সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, তা পূর্বনির্ধারিত, এ জ্ঞান মানুষের মধ্যে সন্তুষ্টির বোধ তৈরি করে। একারণে সে চেষ্টা করেও কোনো কিছু পেতে ব্যর্থ হলে হা-হুতাশ করে না। একজন মুসলিম এই দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু উত্তম তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে, তবে সেটা কখনোই আখিরাত বিসর্জন দিয়ে নয়। আর নিজের সর্বোচ্চটা ঢেলে দেওয়ার পর, আল্লাহর উপর সে ভরসা করবে এবং আল্লাহর ফায়সালা সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে।

---

(১০৮) ১২০ সৌদি গেজেট, নং ৩৮২১, অক্টোবর ২৮, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ০১।

www.pathagar.com

ভাগ্যে বিশ্বাস একজন মানুষকে হতাশাগ্রস্ত হতে, দুঃখে ভারাক্রান্ত হতে কিংবা 'কী হতে পারতো' এ ধরনের আকাশকুসুম চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যের যা আছে তা আমাকেও পেতে হবে- এই চিন্তাটির কারণেই আজকাল বহু মানুষ তাদের সাধ্যের বাইরে খরচ করে জীবন সাজাতে চায়। আর এজন্য তারা ক্রেডিট কার্ড, 'নগদে পাও বাকিতে দাও' ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হচ্ছে।

৩. একটি সুস্থির ব্যক্তিত্ব

জীবনে যা কিছু ঘটে তা পূর্বপরিকল্পিত এবং এর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে ঘটে—এ সচেতনতা একজন মুসলিমের মনে এক অনন্য প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেওয়া অতি সুখ, কিংবা এমন প্রবল দুঃখ-কষ্ট যার কারণে অজ্ঞরা হতাশ হয়ে আল্লাহকে দোষারোপ করা শুরু করে—এমন দুটি চরম অবস্থা থেকে ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়। এভাবে, ভালো এবং মন্দ জিনিসের পরীক্ষা ঈমানদার ব্যক্তিকে উপকৃত করে। সুহাইব ইব্ন সিনান বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

> *"মু'মিন ব্যক্তির বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর! তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মু'মিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যদি দুঃখ-মুসিবত আসে তবে সে সবর করে। অতএব প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।"*(১০৯)

এমনটাই হলো সে ব্যক্তির অবস্থা, যে আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের উপর প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, করতে পেরেছে।

---

(১০৯) সহীহ মুসলিম, ভলিউম ০৪, পৃষ্ঠা ১৫৪১, হাদীস নং ৭১৩৮।

www.pathagar.com

sean
PUBLICATION

বঙ্গোপসাগরের বুকে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। দ্বীপের তীরে বার-বি-কিউ পার্টি। গান বাজছে তারস্বরে। স্বচ্ছ নীল পানিতে ভাসছে ওয়ান-টাইম প্লেট। দ্বীপটির নাম থেকে শুরু করে পুরো দৃশ্যপটে যে আধুনিক সভ্যতার জয়জয়কার তা আমদানি হয়েছে পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজ থেকে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই সর্বব্যাপী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানোর একমাত্র অস্ত্র ইসলাম। তাই পৃথিবীজুড়ে কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় হুমকি ইসলাম।

অধুনা মুসলিমদের মধ্যে ক্ষমতাধর কেউ না থাকলেও ইসলামের একটা নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। এর মূলনীতিগুলোই এই ক্ষমতার মূল উৎস। মানব সভ্যতা ও সামাজিক সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামের বিধানগুলো মানুষকে প্রকৃতির সাথে, অন্য মানুষের সাথে সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। মানুষ যখন স্রষ্টার দেওয়া এ ভারসাম্যটা নষ্ট করে ফেলে তখনই শুরু হয় সভ্যতার সংকট।

ইসলাম আর পশ্চিমা সভ্যতার মূল দ্বন্দ্বটা কোথায়? কী সেই নৈতিক ভিত্তি যাকে এত ভয় পায় পশ্চিমা সভ্যতা? কেমন করে নৈতিক মূল্যবোধ, আল্লাহর দাসত্ব এবং ইসলামের আচার-ব্যবস্থা মিলে মিশে একাকার তা-ই এ বইয়ের মূল উপপাদ্য।

ISBN 9789843368829
9 789843 368829

৳350.00

www.seanpu om